কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

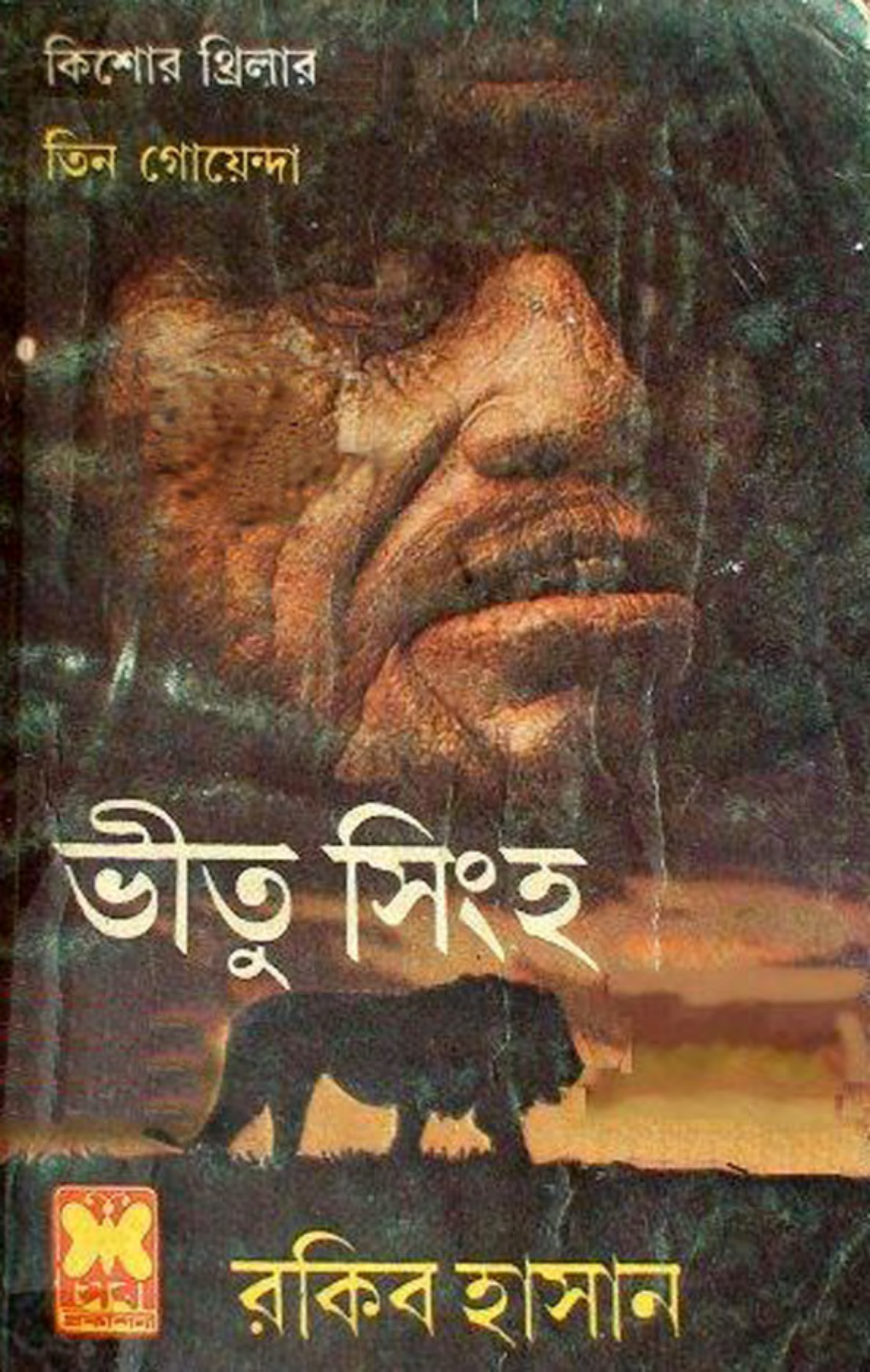

ভীতু সিংহ

রকিব হাসান

ভীতু সিংহ

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৮৯

এঞ্জিনের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়েই শুঙিয়ে উঠলো কিশোর পাশা। 'সর্বনাশ! ট্রাক বোঝাই করে এনেছে চাচা!'

তার দুই বন্ধু মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ডও ফিরে তাকালো। বিশাল লোহার গেট দিয়ে ঢুকছে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ছোট লরিটা। ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, বোরিস চেকোমাসকি গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে বসে আছেন ছোটখাটো একজন মানুষ, ইয়া বড় পাকানো গোঁফ, দাঁতে চেপে রেখেছেন পাইপ। তিনি কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা।

লরি থামলো। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামলেন রাশেদ পাশা।

কিশোর আর তার বন্ধুরা দেখলো, পুরনো মরচে ধরা মোটা লোহার শিকে বোঝাই লরির পিছনটা।

কাঁচে ঘেরা ছোট অফিস ঘরের বাইরে গার্ডেন চেয়ারে বসে ছিলেন মেরিচাচী, উঠে এলেন। 'রাশেদ!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? এগুলো কেন এনেছো?'

'নো, মাই ডিয়ার,' হাসিমুখে বললেন রাশেদ পাশা, 'যা বুঝেছো, তা না। তলায় খাঁচাও আছে কয়েকটা।'

'খাঁচা!' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'আমাদের সবাইকে ধরে ভরবে নাকি ওগুলোতে?'

'আরে না,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন রাশেদ পাশা। 'ওগুলো জানোয়ারের খাঁচা। কিশোর, দেখতো ভালো করে। বিক্রি হবে?'

উঁকি দিয়ে যতোটা সম্ভব দেখলো কিশোর। ধীরে ধীরে বললো, 'মেরামত লাগবে। তবে, বিক্রি হবে···পড়ে থাকবে না। কিন্তু কার কাছে বেচবো?'

'কার কাছে মানে? ওদের কাছে।'

'কাদের কাছে?'

'সার্কাস। প্রতি বছরই তো আসে। তখন দেবো ওদের কাছে বিক্রি করে।'

'কিনবে?' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ।

'কেন কিনবে না? এরকম খাঁচাই তো ওদের দরকার। তুই ভুলে যাচ্ছিস, কিশোর, সার্কাসের দলে ছিলাম আমি একসময়। ওদের কি কি লাগে, ভালো করেই জানি।'

মুচকি হাসলো কিশোর। 'হ্যাঁ, চাচা।' ছেলেবেলায় একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসের দলে চলে গিয়েছিলেন তিনি, সুযোগ পেলেই গর্বের সঙ্গে বললেন সেকথা।

মেরিচাচীর মুখ থমথমে। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন চাচা, 'বোরিস, রোভার, দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি নামাও।'

লরি থেকে মাল নামাতে শুরু করলো দুই ভাই।

পাইপ নিভে গেছে। দিয়াশলাইয়ের জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন রাশেদ পাশা। 'বুঝলেন মেরি, ধরতে গেলে বিনে পয়সায়ই পেয়েছি ওগুলো, পানির দাম। কতগুলো ভাঙা গাড়ির কাছে পড়েছিলো। দেখি, আবার যাবো। আরও আছে, নিয়ে আসবো।' নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি।

'কিশোর,' নিচু কণ্ঠে বললেন মেরিচাচী, 'তোর কি মনে হয়? বিক্রি হবে?'

'তা হবে। তবে একটু সময় লাগবে আরকি। লাগুক। কম দামে যখন পেয়েছে, না আনাটাই বরং ভুল হতো। ভেবো না, ভালো লাভ হবে।'

কিশোরের ওপর মেরিচাচীর অগাধ বিশ্বাস। সে যখন বলছে, হবে, নিশ্চয় হবে। মেঘ কেটে গেল তাঁর মুখ থেকে। বোরিস আর রোভারকে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ দিয়ে অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

দুই ভাইয়ের সঙ্গে তিন গোয়েন্দাও হাত লাগালো। ওগুলো নিয়ে জমা করে রাখতে লাগলো একটা ছাউনির নিচে।

লরির ওপর থেকে ছোট একটা শিক কিশোরের হাতে দিতে দিতে বললো মুসা, 'এটাই শেষ।'

শিকটা হাতে নিয়ে দ্বিধা করলো কিশোর। ওজন আন্দাজ করছে। 'এরকম একটা কিছুই খুঁজছিলাম।'

'কেন?' অবাক হলো রবিন। 'তিন গোয়েন্দার নিজস্ব জাংকইয়ার্ড করবে?'

'দরজার লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। মোবাইল হোমের দরজা খুলে দেবো। দুই সুড়ঙ্গের পাইপের ভেতর দিয়ে যাওয়া অনেক কষ্ট, সব সময় ভাল্লাগে না।'

মুসা খুশি হলো সব চেয়ে বেশি। তার স্বাস্থ্য অন্য দু'জনের চেয়ে ভালো, বেশি লম্বা-চওড়া, পাইপের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে তারই বেশি অসুবিধে হয়। লাফ দিয়ে নেমে এলো সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছলো। 'উফ, মেলা কাম করেছি। ঘাম ছুটে গেছে।'

'তো, এখন...,' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে, পুরনো ছাপার মেশিনটার ওপরে লাল আলোটা জ্বলতে-নিভতে শুরু করেছে।

'ফোন!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'নিশ্চয় কেউ রহস্যের সমাধান করাতে চায়।'

'তাহলে তো ভালোই,' উত্তেজিত হয়ে উঠলো কিশোর। 'অনেক দিন কোনো রহস্য পাচ্ছি না।'

তাড়াতাড়ি এসে দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই হৌ মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালো কিশোর। স্পীকারের লাইন অন করে দিলো। একসংগে এখন তিনজন শুনতে পাবে ওপাশের কথা।

'কিশোর পাশা বলছি।'

'ধরে রাখো, প্লীজ,' মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল স্পীকারে। চিনতে পারলো ওরা, কেরি ওয়াইন্ডার ওরফে মুরুব্বী কেরি ("তিন গোয়েন্দা" দ্রষ্টব্য)। 'মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তিন কিশোরের চেহারা। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার, তার মানে আরেকটা রোমাঞ্চকর রহস্য।

'হ্যালো,' গমগম করে উঠলো একটা ভারি কণ্ঠ, 'কিশোর।'

'বলুন, সার।'

'ব্যস্ত?'

'না, স্যার। কোনো কাজ নেই হাতে।'

'ভেরি গুড। আমার এক বন্ধু একটা সমস্যায় পড়েছে। আমার কাছে এসেছিলো।'

'কি সমস্যা, স্যার? বলা যায়?'

'নিশ্চয়ই। কাল সকালে আমার অফিসে আসতে পারবে?'

'পারবো।'

'বেশ। তখনই বলবো সব।'

দুই

ইশারায় তিন গোয়েন্দাকে বসতে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

বিশাল ডেস্কের এধারে বসলো ছেলেরা।

সামনে টেবিলে রাখা ফাইলের গাদা ঠেলে একপাশে সরালেন চিত্রপরিচালক। মুখ তুলে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন ছেলেদের দিকে। তারপর হঠাৎ যেন ছুঁড়ে দিলেন প্রশ্নটা, 'বুনো জানোয়ার কেমন লাগে তোমাদের?'

অবাক হলো ছেলেরা।

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো কিশোর, 'সেটা কোন ধরনের জানোয়ার তার ওপর নির্ভর করে, স্যার।'

'এমনিতে তো ভালোই লাগে,' মুসা বললো। 'তবে মানুষখেকো বাঘ-সিংহ হলে আলাদা কথা।'

'কোনো রহস্যের কথা বলছেন, স্যার?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'হয়তো,' ধীরে ধীরে বললেন পরিচালক। 'না-ও হতে পারে। তবে তদন্ত বোধহয় একটা করা দরকার।' এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'জাঙ্গল ল্যাণ্ডের নাম শুনেছো?'

'শ্যাটউইকের কাছে একটা উপত্যকায়,' রবিন বললো। 'বুনো জানোয়ারের খামার। ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানাও বলা যেতে পারে। নানারকম জন্তুজানোয়ার আছে। সিংহও আছে। ভালো টুরিস্ট স্পট।'

'হ্যাঁ,' বললেন পরিচালক। 'মালিকের নাম উইলবার কলিনস। আমার পুরনো বন্ধু। একটা বিপদে পড়েছে। সেজন্যেই তোমাদের ডেকেছি।'

'কি বিপদ, স্যার?' জানতে চাইলো কিশোর।

'ভীতু সিংহ।'

চট করে একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।

'জাঙ্গল ল্যাণ্ড সবার জন্যেই খোলা,' আবার বললেন পরিচালক। 'সাধারণ দর্শক তো আছেই, মাঝে মাঝে সিনেমা কোম্পানিও ভাড়া নেয় জায়গাটা। উপত্যকা আছে, ঘন জঙ্গল আছে—ওয়েস্টার্ন আর আফ্রিকান পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাঝে মাঝে জানোয়ারও ভাড়া দেয় উইলবার। তার নিজের ট্রেনিং দেয়া। তার প্রিয় জানোয়ার-গুলোর মধ্যে একটা সিংহ আছে। টিভি আর সিনেমায় অনেক অভিনয় করানো হয়েছে ওটাকে দিয়ে। উইলবারের একটা বড় অ্যাসেট ছিলো।'

'তারমানে এখন আর নেই?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

'অনেকটা সেরকমই। ইদানীং একটা সিনেমা কোম্পানি জাঙ্গল ল্যাণ্ড ভাড়া নিয়েছে শূটিং করার জন্যে। ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সিংহটা। অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে। যে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই অবস্থায় শান্তিতে শূটিং চালানো সম্ভব নয়। তার জায়গার বদনাম হোক, এটাও চায় না উইলবার।'

'সিংহটা কেন এরকম করছে, মানে, ভীত হয়েছে,' কিশোর বললো, 'তা-ই তদন্ত করে দেখতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। খুব দ্রুত আর চুপচাপ কাজটা সারতে হবে। বাইরের কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে।'

শুকনো ঠোঁট চাটলো মুসা। 'জানোয়ারটার কত কাছে যেতে হবে, স্যার?'

মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'তদন্ত করতে হলে যতোখানি যেতে হয়। তবে এতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উইলবার তোমাদের সাহায্য করবে।'

'কিন্তু, স্যার, যতোটা জানি, যে কোনো নার্ভাস জানোয়ার বিপজ্জনক···মানে, খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে···,' বললো রবিন।

'ঠিকই জানো।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'তাহলে আপনার বন্ধুকে বলে দিতে পারেন, স্যার, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আরও তিনটে ভীতু প্রাণী শিগ্রী যোগ হতে যাচ্ছে।'

গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে ফিরলেন পরিচালক। 'কিশোর, তোমার কিছু বলার আছে? তোমরা যাচ্ছো, একথা বলবো উইলবারকে?'

'বলুন।'

হেসে রিসিভার তুলে নিলেন পরিচালক। 'বলে দিচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আশা করছি তোমাদের কাছ থেকে, সুখবর। গুডবাই অ্যাণ্ড গুডলাক।'

বিদায় নিয়ে মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

তিন

শেষ দুপুর। সরু একটা পাহাড়ী পথ ধরে নামছে তিন গোয়েন্দা। নিচের উপত্যকাটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের সারি। রকি বীচ থেকে গাড়িতে আসতে এখানে মিনিট তিরিশেক লাগে। শ্যাটউইকের কাছে কি একটা কাজে এসেছে বোরিস, রাশেদ পাশা পাঠিয়েছেন। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা নিয়ে এসেছে বোরিস, নামিয়ে দিয়ে গেছে তিন গোয়েন্দাকে।

দূর থেকেই চোখে পড়েছে জাঙ্গল ল্যাণ্ডের মস্ত সাইনবোর্ডঃ

'ওয়েলকাম টু জাঙ্গল ল্যাণ্ড'

'বনভূমিতে স্বাগতম,' বিড়বিড় করে ইংরেজিটার বাংলা অনুবাদ করেছে কিশোর। বোরিসের বাহুতে হাত রেখেছে, 'রাখুন এখানেই।'

'হোকে (ওকে),' ব্রেক চেপেছে বোরিস। ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেছে পুরনো ট্রাক।

নামছে ছেলেরা। কানে আসছে নানারকম কিচিরমিচির, কোলাহল। দূর থেকে ভেসে এলো হাতির বৃংহণ, প্রতিধ্বনি তুললো চারপাশের পাহাড়ে। তার জবাবেই যেন আরেকদিকে মেঘ ডেকে উঠলো, বুকের ভেতর কাঁপুনি তুলে দেয়া ভারি গর্জন।

'সিংহ!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

'ভয়ের কিছু নেই,' নিচু কণ্ঠে আশ্বাস দিলো কিশোর, যেন নিজেকেই, 'ওটা

পোষা সিংহ।'

আরও খানিকটা এগিয়ে প্রধান ফটক চোখে পড়লো। বড় নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ আজ বন্ধ।

'অ, এজন্যেই,' বললো রবিন। 'তখন থেকেই ভাবছি, টুরিস্ট স্পট, অথচ কাউকে দেখি না কেন?'

'হয়তো শুটিঙের জন্যেই বন্ধ রাখা হয়েছে,' অনুমান করলো কিশোর।

গেটের কাছে এসে উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক তাকালো রবিন। 'মিস্টার কলিনস কোথায়? আমাদের নিতে আসেননি কেন?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বিড়বিড় করলো মুসা। 'সিংহটাকে বোঝাচ্ছেন আরকি, যাতে খাওয়ার তালিকা থেকে আমাদেরকে অন্তত বাদ দেয়।'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল গেটের পাল্লা, হুড়কো লাগানো নেই। 'বাহ্, খোলাই রেখেছে দেখছি। সিনেমার লোকদের আসা যাওয়ার জন্যেই বোধহয়।'

ভেতরে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

কিচিরমিচির আর বিচিত্র কোলাহল বাড়ছে।

'বানর। পাখি।' ডালের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর। 'নিরীহ প্রাণী।'

'ভেবো না,' ভয়ে ভয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে তাকালো মুসা, 'হারামীটাও নিশ্চয় ধারেকাছেই কোথাও আছে।'

আঁকাবাঁকা সরু পথ। দু'ধারে বড় বড় গাছ, ঘন জঙ্গল। ডাল থেকে নেমেছে লতার দঙ্গল, কোথাও সোজা, কোথাও প্যাঁচানো, কোথাও বা কোঁকড়া চুলের মতো।

'একেবারে আসল বনের মতো,' মুসা বললো।

অন্য দু'জনও একমত। ধীর গতি। সন্দিহান চোখে দেখতে দেখতে চলেছে। ভয়—যেন ঘন ঝোপের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে ভীষণ জানোয়ারটা, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে এসে পড়বে ঘাড়ে। কলরবের কমতি নেই। আবার শোনা গেল ভারি গর্জন।

এক জায়গায় এসে দু'ভাগ হয়ে গেছে পথটা। সাইনপোস্ট রয়েছে।

'ওয়েস্টার্ন ভিলেজ অ্যাণ্ড গোস্ট টাউন,' পড়লো রবিন। বাঁয়ের পথটা দেখিয়ে বললো, 'তাহলে ওদিকে কি আছে?'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর, 'হয়তো জানোয়ারের দল।'

ডানের পথটা ধরলো ওরা।

কয়েকশো গজ এগিয়ে হাত তুলে দেখালো মুসা। 'বাড়ি। মিস্টার কলিনসের অফিস বোধহয়।'

'আমার কাছে তো মালগুদামের মতো লাগছে,' এগোতে এগোতে কিশোর বললো। 'দেখো, একটা কোরালও আছে।'

হঠাৎ, জোরে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো কি যেন। জমে গেল ছেলেরা। পাশের ঘন ঝোপে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

আরেকবার চিৎকার হতেই মস্ত এক ব্যারেল পামের আড়ালে লুকালো ওরা। বুকের ভেতর দুরুদুরু করছে। আবার শব্দ হয় কিনা সে-অপেক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু হলো না। যাদুমন্ত্রে যেন নীরব হয়ে গেছে সমস্ত বন।

'কী ওটা?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'ঠিক বলতে পারবো না। বোধহয় চিতা।'

'কোনো ধরনের বানরও হতে পারে,' রবিন বললো।

যা-ই হোক, আড়াল থেকে বেরোলো না ওরা।

'আল্লাহরে, কি কাণ্ড!' তিক্তকণ্ঠে বললো মুসা। 'এলাম ভীতু সিংহের খোঁজে। এখানে যে ভীতু চিতা আর বানরও আছে, তাতো কেউ বলেনি! নাকি জিনভূতের কারবার!'

'তোমার মাথা,' কিশোর বললো। 'এটা জাঙ্গল ল্যাণ্ড। জন্তুজানোয়ারের খামার। এসব চেঁচামেচি তো হবেই। আমরাই গাধা। এরকম ডাকাডাকি হওয়াই তো স্বাভাবিক। চলো, বাড়িটাতে গিয়ে দেখি।'

আগে আগে চলেছে কিশোর, পেছনে সাবধানে হাঁটছে অন্য দু'জন।

'ওদিক থেকে এসেছে চিৎকারটা,' ভয়ে ভয়ে একটা দিকে দেখিয়ে বিড়বিড় করলো মুসা।

'আটকে রেখেছে হয়তো ওটাকে,' মন্তব্য করলো রবিন, 'তাই ওরকম চেঁচাচ্ছে।'

'বকবক না করে একটু পা চালাও তো,' ধমক দিলো কিশোর।

বাড়িটা পুরনো, রঙচটা দেয়াল। বালতি, গামলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অযত্নে। জানোয়ারকে খাবার দেয়া হতো ওগুলোতে করে। পথের ওপরে ভারি গাড়ির চাকার দাগ, গভীর হয়ে বসেছে। কাত হয়ে ভেঙে পড়েছে কোরালের বেড়া।

শান্ত, নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা, যেন ওদেরই অপেক্ষায়।

'এবার কি?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

পা বাড়ালো কিশোর। 'দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি। মিস্টার কলিনসকে জানানো দরকার, আমরা এসেছি।'

দরজায় থাবা দিলো কিশোর।

সাড়া নেই।

আবার থাবা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'মিস্টার কলিনস, আমরা এসেছি।'

মাথা চুলকালো রবিন। 'বোধহয় এখানে নেই···'

'চুপ! ঠোঁটে আঙুল রাখলো মুসা। 'কিসের যেন শব্দ···'

শব্দটা সবাই শুনতে পেলো। বিচিত্র কটকট। এগিয়ে আসছে। শুকনো পাতায় সাবধানে পা ফেলছে কে যেন।

বড় বড় হয়ে গেছে ছেলেদের চোখ। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার কথা ভাবছে।

বেরিয়ে এলো ওটা। মানুষ দেখে থমকে গেল। তারপর মাথা নিচু করে দৌড়ে এলো, হলদে পা দিয়ে ধুলোর খুদে ঝড় তুলছে বালিতে।

চেয়েই আছে তিন গোয়েন্দা।

চার

'বেশি ভয় পেলে এই অবস্থাই হয়,' মুখ বাঁকালো কিশোর। 'শুরু থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি আমরা। তাই যা শুনছি, তাতেই চমকে উঠছি। সাধারণ একটা মোরগও আমাদের কলজে কাঁপিয়ে দিলো। ধ্যাত্তোর!'

'হারামজাদা!' মোরগটাকে তাড়া করলো মুসা। 'শয়তানীর আর জায়গা পাওনি?'

'ওটার কি দোষ?' পেছন থেকে বললো রবিন। 'ভয় পাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছি আমরা, তাই ভয় পাইয়েছে। পাগলামি করো না, এসো।'

কঁককঁক করে একটা ঝোপে লুকালো বনমোরগটা।

ধাক্কা দেয়ার জন্যে আবার দরজার দিকে হাত বাড়ালো কিশোর।

'কিশোর, ওই দেখো,' রবিন থামালো তাকে।

দেখলো তিনজনেই। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে নড়াচড়া। খাকি পোশাক পড়া একজন মানুষ বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে।

'মিস্টার কলিনস!' চিৎকার করে ডাকলো কিশোর।

থেমে, ফিরে তাকালো লোকটা।

ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আপনাকে সেই কখন থেকে খুঁজছি,' মুসা বললো।

ছেলেদের দেখছে লোকটা। চোখে প্রশ্ন। বেঁটে, চওড়া বুক, রঙজ্বলা সাফারি শার্টের গলা থেকে নিচের অর্ধেকটার বোতাম খোলা। মুখের রোদেপোড়া তামাটে চামড়ার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান উজ্জ্বল নীল চোখের তারা। লম্বা নাকের একটা ফুটো আরেকটার চেয়ে চাপা। মাথায় পুরনো একটা হ্যাট, চওড়া কানার একদিকের প্রান্ত বাঁকা হয়ে ঝুলে প্রায় ঢেকে দিয়েছে এক কান।

ছেলেদের এগিয়ে আসতে দেখে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো লোকটা। ঝিক করে

উঠলো হাতের জিনিসটা। আলগোছে ধরে রেখেছে লম্বা, তীক্ষ্ণধার একটা ভোজালি।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে দ্রুত বললো কিশোর, 'আমরা তিন গোয়েন্দা, মিস্টার কলিনস। মিস্টার ক্রিস্টোফারতো ফোনে জানিয়েছেন আপনাকে। জানাননি?'

অবাক মনে হলো লোকটাকে। চোখ মিটমিট করলো। 'অ্যাঁ··· ও, হ্যাঁ, মিস্টার ক্রিস্টোফার। কি যেন বললে? তোমরা তিন গোয়েন্দা, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার কলিনস।' পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

পড়লো লোকটা।

'ও মুসা আমান,' পরিচয় করিয়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'আর ও রবিন মিলফোর্ড। আপনার ভীতু সিংহটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এলাম।'

'তাই?'

'মিস্টার ক্রিস্টোফার তো তাই বললেন। আপনার সিংহটা নাকি নার্ভাস।'

মাথা ঝোঁকালো লোকটা। কার্ডটা পকেটেই রাখলো। দূরে হাতির চিৎকার আর সিংহের গর্জন হতেই ভ্রূকুটি করে তাকালো সেদিকে। হাসি ফুটলো মুখে। 'বেশতো, ভয় না পেলে এসো আমার সঙ্গে। সিংহটাকে দেখবে তো?'

'সেজন্যেই তো এসেছি।'

'এসো তাহলে।'

আচমকা ঘুরে বনে ঢুকে পড়লো আবার লোকটা। সরু একটা বুনোপথ ধরে এগোলো। পেছনে চললো ছেলেরা।

'ব্যাপারটা খুলে বলবেন, মিস্টার কলিনস?' চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

ঝিলিক দিয়ে উঠলো আবার ধারালো ভোজালি। খুব সহজেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল শক্ত মোটা লতা। 'কি জানতে চাও?' গতি সামান্যতম কমালো না লোকটা।

ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে কিশোরকে। 'ওই সিংহটার কথা আরকি। সিংহের ভীতু হওয়া, কেমন অস্বাভাবিক না?'

মাথা নোয়ালো শুধু লোকটা। চলার গতি আরও বাড়ালো। একনাগাড়ে কুপিয়ে কাটছে লতা, ঘন ঝোপঝাড়ের ডালপাতা, পথ করে নিচ্ছে। 'মোটেও অস্বাভাবিক নয়। সিংহের চালচলন জানো কিছু?'

অবাক হলো কিশোর। 'না, স্যার। সেটাই তো জানতে চাইছি। আজব কাণ্ড, তাই না? মানে সিংহের ভীতু হওয়া···'

'হ্যাঁ।' কাটা জবাব দিলো লোকটা। হাত তুলে চুপ করতে বললো। মৃদু কিচমিচ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বোম ফাটলো যেন কানের কাছে। হাসলো লোকটা। 'এই, সামনেই রয়েছে! কেমন লাগলো? ভীতু?'

'আ–আমি জানি না। স্বা–স্বাভাবিকই তো লাগলো,' ভয় পেয়েছে যে, এটা বুঝতে দিতে চাইলো না কিশোর।

'ঠিক,' বেরিয়ে থাকা একটা ডালে কোপ মারলো লোকটা। 'মোটেও ভীতু নয় সিংহ।'

'কিন্তু···,' বলতে গিয়েও বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।

'যদি না,' আগের কথার খেই ধরে বললো লোকটা, 'তাকে নার্ভাস হতে সাহায্য করা না হয়, মানে, হয়ে থাকে। বুঝেছো কিছু?'

মাথা ঝাঁকালো ছেলেরা।

'কিন্তু কিসে বাধ্য করলো?' প্রশ্ন করলো রবিন।

জবাব না দিয়ে ঝট করে একপাশে সরে গেল লোকটা। 'চুপ! নড়বে না। কাছেই আছে।' ছেলেরা কিছু বুঝে উঠার আগেই পাশের লম্বা ঘাসবনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল তার পদশব্দ, গায়ের সঙ্গে ঘাসের ঘষা লাগার আওয়াজ। তারপর কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল।

মাথার ওপর কর্কশ চিৎকার করলো একটা পাখি। চমকে উঠলো ছেলেরা।

'ভয় পেও না,' সত্যিকার ভয়ের মুহূর্তে আশ্চর্যরকম সাহসী হয়ে ওঠে স্বভাবভীতু মুসা আমান। 'ওটা একটা সাধারণ পাখি।'

'শকুন–টকুন কিছু,' রবিন বললো।

আরও কয়েকটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেরা। ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'আমার মনে হয়, শকুনটা কিছু বোঝাতে চেয়েছে।'

'কী?' রবিনের প্রশ্ন।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিশোরের চেহারা। শুকনো ঠোঁট চাটলো। 'মনে হচ্ছে আর ফিরে আসবে না মিস্টার কলিনস। আমাদের কোনো ধরনের পরীক্ষায় ফেলে গেছেন। হয়তো আমাদের স্নায়ুর জোর দেখতে চাইছেন। জন্তুজানোয়ারকে কতোখানি ভয় পাই আমরা, তদন্ত করতে পারবো কিনা···'

'কিন্তু কেন?' বাধা দিলো মুসা। 'কি কারণ থাকতে পারে? এখানে তাঁকে সাহায্য করতেই এসেছি আমরা। কেন আমাদের বিপদে ফেলতে যাবেন?'

জবাব দেয়ার আগে কান পেতে কয়েক মুহূর্ত কি শুনলো কিশোর। গাছের মাথায়, ডালে যেন পাগল হয়ে গেছে পাখি আর বানরের দল। আবার শোনা গেল সেই ভয়াবহ কানফাটা গর্জন।

সেদিকে ইঙ্গিত করে কিশোর বললো, 'কি কারণ জানি না। তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি, আরও কাছে এসেছে সিংহ। এদিকেই আসছে। শকুনটা এটাই বোঝাতে চেয়েছিলো। পাখি আর বানরের দলও তাই বলছে।'

কান পেতে আছে ছেলেরা। আতঙ্কিত।

ঘাসে ঘষার আওয়াজ উঠছে। চাপা ভারি পায়ের শব্দ।

গায়ে গা ঘেঁষে এলো ওরা। একটা গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো।

ঠিক এই সময়, আবার গর্জে উঠলো সিংহটা, একেবারে কানের কাছে।

পাঁচ

'কুইক!' বলে উঠলো কিশোর। 'গাছে ওঠো। বাঁচতে চাইলে।'

চোখের পলকে কাছের গাছটায় চড়ে বসলো তিন গোয়েন্দা। মসৃণ কাণ্ড। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ওরা, মাটি থেকে বড় জোর ফুট দশেক ওপরে বসেছে। এর বেশি ওপরে ওঠার উপায় নেই, ডাল এতো সরু, ভেঙে পড়বে।

হাত তুলে ঘাসবন দেখালো মুসা। নড়ছে কিছু।

হালকা শিস শোনা গেল। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওদেরই বয়েসী একটা ছেলে। সতর্ক।

'এই!' ডাকলো রবিন। 'আমরা এখানে।'

ঝট করে মাথা তুললো ছেলেটা। একই সংগে উঠে গেল তার হাতের রাইফেলের নল। 'কে তোমরা?'

'ব-বন্ধু! রাইফেল সরাও।'

'আমাদের ডেকে আনা হয়েছে এখানে,' যোগ করলো মুসা। 'আমরা তিন গোয়েন্দা।'

'মিস্টার কলিনস,' কিশোর বললো, 'এখানে রেখে গিয়েছেন আমাদের। কি যেন দেখতে গেছেন।'

রাইফেল নামালো ছেলেটা। 'নেমে এসো।'

নামলো তিন গোয়েন্দা।

ঘাসবন দেখিয়ে কিশোর বললো, 'একটু আগে ওখানে সিংহের গর্জন শুনেছি। গাছে থাকাই কি ভালো ছিলো না?'

হাসলো ছেলেটা। 'ও তো ভিকটর।'

ঢোক গিললো মুসা। 'ভিকটর। সিংহের নাম ভিকটর?'

মাথা নোয়ালো ছেলেটা। 'হ্যাঁ। ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পোষা।'

উঁচু ঘাসবনে আবার শোনা গেল গর্জন। খুব কাছে।

স্থির হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'ও-ওই ডাক শুনেও ভয় না পেতে বলছো?' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে

মুসা।

'প্রথম প্রথম শুনলে ভয় একটু লাগেই। কিন্তু ও ভিকটর। কারো ক্ষতি করে না।'

মট ক'রে শুকনো একটা ডাল ভাঙলো।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। 'এতো শিওর হচ্ছো কিভাবে?'

'এখানেই কাজ করি আমি,' হাসছে ছেলেটা। 'রোজ দেখি ভিকটরকে। ও, আমার নামই তো বলিনি এখনও। আমি ডিকার কলিনস। ডিক।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বললো কিশোর। নিজেদের নাম জানালো একে একে। তারপর বললো, 'আচ্ছা তোমার বাবার ব্যাপারটা কি বলো তো? আমাদের সংগে এই রসিকতা কেন?'

অবাক মনে হলো ডিককে।

'এখানে জঙ্গলের মাঝখানে ফেলে গেল,' রাগ চাপা দিতে পারলো না মুসা। 'কাছাকাছি রয়েছে সিংহ। এটা কোনো রসিকতা হলো?'

'সেজন্যেই গোলমাল শুরু হয়েছে এখানে,' রবিনও রেগেছে। 'এরকম করতে থাকলে ব্যবসা বেশিদিন চালাতে পারবে না। কেউ আসবে না শেষে।'

রীতিমতো অবাক মনে হলো ডিককে। 'কি বলছো? প্রথম কথা, আমি উইলবার কলিনসের ছেলে নই, ভাতিজা। দুই নম্বর, চাচা এখানে রেখে যায়নি তোমাদের, যেতে পারে না। কারণ, ভিকটরকে আমরাই খুঁজছি! অপরিচিত কাউকে এখানে ফেলে যাবে চাচা, প্রশ্নই ওঠে না।'

বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর, 'সত্যি বলছি আমরা, ডিক। মিস্টার কলিনস সাথে করে আমাদের এখানে নিয়ে এসে ফেলে গেছেন। সিংহের ডাক শুনে, আমাদের এখানে থাকতে বলে ঢুকে গেছেন ঘাসবনে। তারপর থেকে আছি এখানে, অনেকক্ষণ ধরে আছি।'

জোরে মাথা নাড়লো ডিক। 'কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। চাচা হতেই পারে না। সারাক্ষণ আমি ছিলাম তার সংগে, এইমাত্র এলাম। অন্য কেউ হবে। কি-রকম দেখতে?'

লোকটার বর্ণনা দিলো রবিন।

শুনে বললো ডিক, 'বললাম না, ভুল হয়েছে। ও আমার চাচা নয়। ওর নাম টোল কিন। এখানে অ্যানিমেল ট্রেনারের কাজ করতো।' লম্বা ঘাসের দিকে তাকিয়ে কান পেতে কিছু শুনলো সে। 'কিন্তু এখানে আবার ঢুকলো কিভাবে? চাচা তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে?' কথাটা ধরলো কিশোর। 'কেন?'

'জানোয়ারের সংগে দুর্ব্যবহার করতো। চাচা এসব পছন্দ করে না। তার ওপর,

লোকটার স্বভাব-চরিত্রও ভালো না, খালি গোলমাল পাকানোর তালে থাকে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে।'

'কি জানি,' চিন্তিত দেখালো কিশোরকে। 'লোকটাকে তো বিন্দুমাত্র মাতাল মনে হলো না। বেশ শান্ত।'

'আর আমাদের সঙ্গেই বা তার কিসের শত্রুতা?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমাদেরকে বিপদে ফেলে যাবে কেন?'

'বুঝতে পারছি না,' ডিকও ভাবছে। 'আচ্ছা, কেন এসেছো তোমরা বলেছো নাকি?'

কপাল চাপড়ালো কিশোর। 'সব বলে দিয়েছি। মিস্টার ক্রিস্টোফার আমাদের পাঠিয়েছেন, একথাও বলেছি তাকে। এখন মনে পড়ছে, সিংহের নার্ভাসনেসের কথা শুনে অবাক হয়েছিলো সে।'

'কিন্তু তাতেই বা কি হয়েছে?' রবিন বললো। 'টোল কিনকে তাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের হাত ছিলো না। আমরা তার শত্রু নই।'

'কারণটা সিংহ হতে পারে,' কিশোর ব্যাখ্যা দিলো। 'সিংহের কেস নিয়ে এখানে এসেছি আমরা। কিন হয়তো চায় না, সিংহটা কেন নার্ভাস হয়েছে সেটা আমরা বের করে ফেলি।'

'তা হতে পারে,' একমত হলো ডিক। 'কিনই হয়তো ভিকটরকে ছেড়ে দিয়েছে। নিজে নিজে বেরিয়ে যায়নি সিংহটা, এখন মনে হচ্ছে।'

'তোমার চাচার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তিনি হয়তো আরও কিছু জানাতে পারবেন,' বললো কিশোর। 'চলো, যাই।'

'কিশোর!' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'কি!'

'ঠিক আমাদের পেছনে…,' রবিনের গলা কাঁপছে, 'বিরাট এক সিংহ। পোষা তো মনে হচ্ছে না!…ঘুনো…'

ফিরে চেয়ে বললো ডিক, 'হ্যাঁ, ভিকটরই। আমাকে চেনে ও। তোমরা চুপ করে থাকো। আমি ওকে সামলাচ্ছি।'

আশ্বস্ত হতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। দেখছে, এক পা বাড়ালো ডিক। এক হাত তুললো। 'ভিকটর, শান্ত হও ভিকটর। আমি…আমরা…ভিকটর, লক্ষ্মী ছেলে।'

জবাবে চাপা গর্জন। কেশর ফুলিয়ে চেহারা ভীষণ করে তুললো সিংহ। এগোতে শুরু করলো। মাথা নোয়ানো। হলদে চোখে সন্দেহ। বিশাল মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে গর্জে উঠলো আবার। ফুট দশেক দূরে এসে থামলো। ঝুলে পড়েছে মস্ত চোয়াল, বাঁকা, তীক্ষ্ণধার শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে।

গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এলো ভারি, চাপা গর্জন। এগিয়ে আসতে লাগলো আবার।

অসহায় চোখে দেখছে তিন গোয়েন্দা। পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে, নড়ার ক্ষমতা নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। আবার কথা বললো ডিক, 'শান্ত হও, ভিকটর। চুপ হও। তুমি আমাকে চেনো। শান্ত হও। লক্ষ্মী ছেলে।'

এপাশ ওপাশ লেজ নাড়তে শুরু করলো সিংহ। মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি বেরোলো আবার কণ্ঠ থেকে। আরেক কদম আগে বাড়লো।

অস্বস্তিতে মাথা নাড়লো ডিক। 'কি জানি হয়েছে ওর। আমাকে চেনে। অথচ, এখন যেন চিনতে পারছে না।'

ধীরে, খুব ধীরে পিছাতে শুরু করলো ডিক।

এগিয়ে আসছে সিংহ।

ছয়

পাথর হয়ে গেছে যেন তিন গোয়েন্দা।

সিংহটার সংগে নিচুস্বরে কথা বলে চলেছে ডিক, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। শান্ত হচ্ছে না ভিকটর।

ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের, কিন্তু ব্রেনটা কাজ করছে ঠিকমতোই। জোর ভাবনা চলেছে মাথায়। সিংহটার ব্যবহারে অবাক হয়েছে। ডিকার কলিনসকে যেন চিনতেই পারছে না! কেন?

গোলমালটা কোথায়, হঠাৎ আবিষ্কার করলো কিশোর। সিংহটা যাতে চমকে না যায়, এমনিভাবে নিচু কণ্ঠে বললো, 'ডিক, সামনের বাঁ পা-টা দেখো। কাটা।'

দেখলো ডিক। রক্ত লেগে রয়েছে। 'এজন্যেই কথা শুনছে না। আহত সিংহ খুব ভয়ানক। কি যে করি!'

'রাইফেল তো আছে,' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। 'দরকার পড়লে গুলি করো।'

'এটা পয়েন্ট টু-টু। কিছুই হবে না ওর। গুলি লাগলে আরও রেগে যাবে। এটা আমি সংগে রাখি ইমার্জেন্সীর জন্যে, ওয়ার্নিং শট...'

আরেক পা এগোলো সিংহ। বিকট হয়ে উঠেছে চেহারা।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছাতে লাগলো তিন গোয়েন্দা, যে গাছ থেকে নেমেছিলো সেটার দিকে।

'খবরদার,' হুঁশিয়ার করলো ডিক। সে চেষ্টাও করো না। পা ওঠানোর আগেই

ধরে ফেলবে।'

'ফাঁকা আওয়াজ করো তাহলে,' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করো ওকে।'

'কোনো লাভ হবে না। মাথা নিচু করে রেখেছে। তারমানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওটা।' ঠোঁট কামড়ালো ডিক। 'ইস্, এখন চাচাকে বড্ড দরকার...'

লম্বা ঘাস সরানোর শব্দ হলো। 'আমি এসেছি,' শুকনো কণ্ঠস্বর। 'চুপ, একদম চুপ। একটা আঙুল নড়াবে না কেউ।'

সহজ ভঙ্গিতে এগোলেন আগন্তুক। কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ভিকটর, কি হয়েছে?'

যেন কথার কথা, স্বাভাবিক প্রশ্ন। কাজ হলো। মাথা ঘোরালো সিংহ। লেজ নাড়লো। গর্জে উঠলো গলা ফাটিয়ে।

মাথা ঝাঁকালেন আগন্তুক। লম্বা, ব্রোঞ্জরঙ চামড়া। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ধরলেন সিংহের বিশাল মাথাটা। 'দেখি তো, কি হয়েছে?'

আবার বিকট হাঁ করলো সিংহ। ছেলেরা ভেবেছিলো, গর্জে উঠবে। তা না করে গুঙিয়ে উঠলো। আস্তে করে তুলে ধরলো আহত পা-টা।

'আহ্হা, খুব কেটেছে তো,' দরদ-মেশানো কণ্ঠে বললেন কলিনস। 'দাঁড়াও, ঠিক করে দিচ্ছি।' পকেট থেকে রুমাল বের করে কাটা জায়গা বেঁধে দিতে শুরু করলেন।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সিংহ।

শেষ গিঁটটা বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন কলিনস। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন সিংহের কানে, কেশরে। 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। সব ঠিক হয়ে যাবে। এটা একটা জখম হলো নাকি?'

হেসে, ফিরে চাইলেন তিনি।

চাপা ছোট্ট একটা গর্জন করলো সিংহ। কাঁপছে মুখের পেশী। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। এসে পড়লো কলিনসের গায়ের ওপর, তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

আতঙ্কিত চোখে দেখলো তিন গোয়েন্দা, মানুষটাকে মাটিতে ফেলে তাঁর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে বিশাল জানোয়ারটা। ডিকের দিকে চেয়ে অবাক হলো ওরা। হাসি ফুটেছে ছেলেটার মুখে।

বুঝতে না পেরে কিশোর বললো, 'কিছু একটা করো!'

'গুলি করো, গুলি করো!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

'ভয়ের কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বললো ডিক। 'খেলছে চাচার সঙ্গে।'

তাদেরকে আরও অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠলেন কলিনস। জড়িয়ে

ধরলেন সিংহটাকে।

গরগর করছে সিংহ, আনন্দ প্রকাশের সময় বেড়াল যেমন করে।

গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সিংহটাকে সরিয়ে উঠে বসলেন কলিনস। ধুলো ঝাড়তে শুরু করলেন শরীর থেকে। 'বেজায় ভারি। ও সেটা বোঝে না। ভাবে, এখনও বুঝি সেই বাচ্চাটিই আছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। ডিকের দিকে ফিরে বললো, 'উফ্, ভয়ে মারা যাচ্ছিলাম্। ওভাবেই খেলে নাকি সব সময়?'

'তাতে ভয়ের কিছু নেই,' বললো ডিক।

'কিন্তু মিস্টার ক্রিস্টোফার যে বললেন…,' কলিনসের দিকে ফিরলো কিশোর। 'মিস্টার কলিনস, আমরা তিন গোয়েন্দা। আপনার বন্ধু মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন। উনি বললেন সিংহটা কোনো কারণে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।'

'ঠিকই বলেছেন,' স্বীকার করলো কলিনস। 'নিজের চোখেই তো দেখলে ঘটনা। আগে এরকম ব্যবহার কখনও করতো না ভিকটর। ইদানীং ওর ওপর আর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।'

'কেন এরকম করে? পা কাটা বলে? আপনার কি মনে হয়নি, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়?'

'মানে?' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল কলিনসের মুখ থেকে।

'ওই যে কাটাটা, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়ে থাকতে পারে। ধরুন, কোনো ভোজালি…'

'তাই তো!' মাথা ঝাঁকালেন কলিনস।

'আমরা আরেকজনের দেখা পেয়েছিলাম, স্যার। ভুলে তাকে আপনি ভেবেছি। হাতে একটা ভোজালি ছিলো। সে-ই আমাদেরকে এখানে এনে ফেলে গেছে।'

'টোল কিনের কথা বলছে, কাকু,' ডিক জানালো। 'ও-ই নিশ্চয় ভিকটরকে ছেড়েছে।'

চোয়াল কঠিন হলো কলিনসের। 'টোল কিন? আবার এসেছে? সিংহটার দিকে তাকালেন তিনি। 'এখন বোঝা যাচ্ছে, কে ছেড়েছে ভিকটরকে। টোল এখানে এনেছে তোমাদেরকে?'

'হ্যাঁ,' বললো রবিন। 'তারপর দাঁড়াতে বলে চলে গেছে।'

'ওর পক্ষেই ভিকটরের পা কাটা সম্ভব,' মুসা বললো। 'একসময় সিংহটার ট্রেনার ছিলো। কাছে গিয়েছে সহজেই। ভোজালি দিয়ে পা কেটেছে।'

'তাই যদি হয়,' গম্ভীর হয়ে বললেন কলিনস, 'শেষবারের জন্যে শয়তানী করেছে। এখানে আবার ঢুকলে ভিকটরই ওকে ধরবে। আর ভিকটরের ধরা মানে…'

বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি। আদর করে সিংহের কানে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। তোমরাও এসো।'

'ডাক্তারের জন্যে বাইরে যেতে হবে নাকি?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না,' জবাব দিলো ডিক। 'আমাদের নিজস্ব পশুচিকিৎসক আছে। ডাক্তার হ্যালোয়েন।'

সাত

বন থেকে একটা গলিপথে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। টেইলবোর্ড নামিয়ে ভিকটরকে গাড়িতে তুলে বাঁধলেন কলিনস।

'এসো,' সদ্য পরিচিত তিন বন্ধুকে ডাকলো ডিক। 'আমরা সামনে উঠে বসি।'

গাড়ি চালালেন কলিনস।

'কোথেকে ভিকটরকে ছাড়া হলো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'সাধারণত কোথায় রাখা হয় তাকে?'

'বাড়িতেই থাকে,' জবাব দিলেন কলিনস। 'আমার আর ডিকের সঙ্গে।'

আঁকাবাঁকা পথ ধরে ঢাল বেয়ে উঠছে গাড়ি। খোঁয়া বিছানো পথ, এগিয়ে গেছে একটা বড় শাদা বাড়ির দিকে।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি রাখলেন কলিনস। 'ডিক, ডাক্তারকে খবর দাও।'

পাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলো ডিক।

অবাক হয়ে বাড়িটা দেখছে কিশোর। 'এখানে থাকেন? গুদামঘরটা দেখে আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ওখানেই বুঝি থাকেন।'

'ওটা একটা শো,' হেসে বুঝিয়ে বললেন কলিনস। 'নানারকম লোক আসে এখানে। এটা অ্যানিম্যাল ফার্ম, আবার র‍্যাঞ্চও বলতে পারো। বুনো পশ্চিমের একটা গন্ধ রাখতে চেয়েছি। কিছু কিছু দর্শক আছে, পছন্দ করে এসব। সিনেমা কোম্পানিরও কাজে লাগে। একটা কোম্পানি শুটিং করছে এখন, একটা জংলী ছবি বানাচ্ছে।'

'মিস্টার ক্রিস্টোফার বলেছেন। শুটিঙে নাকি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে সিংহটা?'

'হ্যাঁ। ওকেও ভাড়া নিয়েছে কোম্পানি। কিন্তু ওটা যা ব্যবহার শুরু করেছে, আমার তো ভয় হচ্ছে, সাংঘাতিক কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না করে বসে। ফ্র্যাঙ্কলিন সিন্-এর দলের কাউকে খুন করলেও অবাক হবো না।'

'ফ্র্যাঙ্কলিন সিন কে?' জানতে চাইলো রবিন।

'নামটা পরিচিত লাগছে,' মুসা বললো। 'আমার বাবা সিনেমায় কাজ করে।

সিন···সিন···নামটা বাবার মুখেই বোধহয় শুনেছি।'

'হতে পারে। সিন তো খুব বিখ্যাত লোক। বড় প্রডিওসার, ডিরেক্টর···অন্তত সে নিজে তো তা-ই মনে করে।'

ডিককে বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতে দেখে নামলেন কলিনস। টেইলবোর্ড খুললেন।

কাছে এসে পথের দিকে দেখলো ডিক, ধুলোর ঝড় ছুটে আসছে। 'ঝামেলা আসছে, কাকু।'

কলিনসও ফিরে তাকালেন। কাছাকাছি হলো ভুরু। 'হ্যাঁ। ফ্র্যাঙ্কলিন সিন।'

একটা স্টেশন ওয়াগন এগিয়ে আসছে। কাছে এসে থামলো। সামনের সিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো একজন বেঁটে, মোটা, টাকমাথা লোক। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে হেঁটে এলো। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, রেগেছে।

'কলিনস,' চেঁচিয়ে বললো সে, 'আমাদের চুক্তি ঠিক রাখতে বলেছিলাম।'

দরদর করে ঘামছে পরিচালক।

শান্তকণ্ঠে বললেন কলিনস, 'কি বলছেন? চুক্তিটা বেঠিক হয়েছে কোথায়?'

মুঠোবদ্ধ হাত কলিনসের মুখের সামনে ঝাঁকালো পরিচালক। 'চুক্তিতে আছে, আমার লোকদের কোনো বিপদ হবে না। অথচ···। এর জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাকে।'

ভুরু উঁচু হলো কলিনসের। 'কি ঘটেছে?'

'আমাকে ফোন করেছে, জন প্রাইস নাকি জখম হয়েছে। কি ভাবে হয়েছে, জিজ্ঞেস করিনি। আমি শিওর, আপনার জানোয়ারের কাজ।'

'অসম্ভব!'

হাত তুলে ভ্যানের বিশাল সিংহটাকে দেখালো পরিচালক। 'ওই তো, প্রমাণ তো ওখানেই আছে। আপনার পোষা সিংহ। আমি জানতে পেরেছি, ঘন্টাখানেক আগেও ছাড়া ছিলো ওটা, বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কি, অস্বীকার করতে পারবেন?'

'না, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এতে প্রমাণ হলো না, জন প্রাইসকে ভিকটরই আক্রমণ করেছিলো। আমি বিশ্বাস করি না।'

'নিজের চোখে যখন দেখবেন, ঠিকই বিশ্বাস করবেন।'

'বেশি জখম হয়েছে?' নরম হলেন কলিনস।

'কি করে বলবো? দেখিইনি এখনও। তবে সিংহ হামলা চালালে কি কেউ কম জখম হয়?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসলো কলিনসের। 'দেখুন, এখনও জানি না আমরা, আপনিও জানেন না, ভিকটরই কাজটা করেছে কিনা।'

'আর কে করবে তাহলে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করবো। হাতের কাজটা আগে সেরে নিই...'

গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। ছোট পুরনো একটা লরি ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে।

'ডাক্তার হ্যালোয়েন,' ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে জানালো ডিক।

ব্রেক কষলেন ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটা। নেমে এলেন লরি থেকে। লম্বা, পাতলা শরীর। পুরু গোঁফের তলা থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা সিগারেটের গোড়া, আগুন নিভে গেছে। হাতে কালো ডাক্তারী-ব্যাগ। লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এলেন জটলার কাছে।

সিংহটার ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। সিনকে এড়িয়ে গিয়ে কলিনসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিক ফোন করলো,' মোটা খসখসে কণ্ঠস্বর। 'কি করে জখম হলো?'

'আমরা বাড়ি ছিলাম না। এই সুযোগে কে জানি ছেড়ে দিয়েছে। পা কেটে দিয়েছে।'

'ভোজালি দিয়ে কেটেছে,' সুর মেলালো ডিক।

ডিকের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলেন ডাক্তার। 'কে করেছে?' জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন, 'দেখলেই বুঝবো, কি করে কেটেছে। উইলবার, ধরো ওকে শক্ত করে।'

ভিকটরের কেশর চেপে ধরলেন কলিনস।

কোমল গলায় ডাক্তার বললেন, 'ভিকি, বয়, দেখি তো কি হয়েছে?'

আহত পা-টা তুলে ধরে আস্তে করে রুমালটা খুললেন তিনি। গুঙিয়ে উঠলো সিংহ।

'আহা, অমন করছো কেন?' খসখসে কণ্ঠ মোলায়েম করতে চাইলেই কি আর হয়? কিন্তু পরিচিত মানুষ, আপত্তি করলো না সিংহ। 'ব্যথা করছে?...হুম। কাটা কম, তবে গভীর বেশি। ডিসপেনসারিতে নিয়ে যাই। এখানে থাকলে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে।'

'দরকার হলে নিয়ে যাও,' বললেন কলিনস। 'ভিকটর, যা ডাক্তারের সংগে।'

লরির দিকে এগোলেন ডাক্তার। পথরোধ করলো পরিচালক। 'ব্যাপারটা কি?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো সে। 'সিংহটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমি ভাড়া করেছি ওকে। কাল সকাল আটটায় শুটিং।'

ধীরেসুস্থে সিগারেটের গোড়াটা ধরালেন ডাক্তার। ধোঁয়া ছাড়লেন পরিচালকের নাকেমুখে। 'আমি যখন বলবো, তখন থেকে কাজ শুরু করবে সিংহটা। কাল সকালে

ওর পা ভালো হয়ে গেলে, ভালো, নইলে থাকবে আমার কাছেই। রোগীকে সুস্থ করা আমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব। আপনার ছবির কি হবে সেটা আপনি জানেন। সরুন, পথ ছাড়ুন।'

চুপচাপ এই নাটক উপভোগ করছে তিন গোয়েন্দা। ভেবেছিলো, বোমা ফাটবে। কিন্তু তাদেরকে অবাক করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো সিন।

কলিনস আর ডাক্তার দু'জনে মিলে ভিকটরকে লরিতে উঠতে সাহায্য করলেন।

সিন এসে দাঁড়ালো কলিনসের সামনে। 'আবার বলছি আপনাকে, কাল সকালে সময়মতো যেন পাই সিংহটাকে। নইলে···তো, এখন কি জন প্রাইসকে দেখতে যাবেন?'

নীরবে পরিচালককে অনুসরণ করে তার স্টেশন ওয়াগনে গিয়ে উঠলেন কলিনস। জানালা দিয়ে মুখ বের করে কিশোরের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'সরি, কিশোর। তোমাদের সংগে পরে কথা বলবো।'

চিন্তিত চোখে তাকিয়ে রইলো কিশোর যতোক্ষণ না গাড়িটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল, যদি সত্যি হয়।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার।

'কি সত্যি হয়?' প্রশ্ন করলো ডিক। 'কার জন্যে খারাপ? আমার চাচা, না সিন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কিশোর। 'তোমার চাচাকে কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো, ডিক।'

'হ্যাঁ। চাচার খারাপ হলে আমারও খারাপ। বাবা-মা নেই আমার, মারা গেছে। কেউ নেই এই এক চাচা ছাড়া। ও, আর আছে সিলভার।'

'সিলভার?' রবিন বললো।

'আমার আরেক চাচা, সিলভার কলিনস। বড় শিকারী, ভ্রমণকারী। আফ্রিকার কতো জায়গা যে সফর করেছে। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে ওই চাচাই তো জন্তুজানোয়ার পাঠায়।'

'আচ্ছা, এই স্ট্যাঙ্কলিন সিনের ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'খুব বদমেজাজী মনে হলো। বলতে গেলে দুর্ব্যবহারই করলো তোমার চাচার সংগে।'

'জানি না। হয়তো শিডিউল ফেল করার ভয়ে সময়মতো বাজারে ছাড়তে চায় আরকি ছবিটা। তাছাড়া মেজাজ দেখানোটা অহেতুক নয়। তার সংগে একটা চুক্তি হয়েছে, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে কোনো বিপদ আপদ হবে না, নিরাপদে কাজ করতে পারবে। এখন গোলমাল দেখলে তো রাগবেই।'

'সত্যি যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, কি হবে তাহলে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'চাচার বড় রকমের ক্ষতি হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। পঞ্চাশ হাজার ডলারে তাড়া নিয়েছে সিন। ওই টাকা তো ফিরিয়ে দিতে হবেই, জাঙ্গল ল্যাণ্ডেরও বদনাম হয়ে

যাবে। সিনেমা কোম্পানি আর ভাড়া নিতে আসবে না, এমন কি টুরিস্ট আর সাধারণ দর্শকও কমে যাবে।'

'হুঁ,' বললো কিশোর, 'তাহলে তো ভাবনারই কথা। সেজন্যেই এতোটা উতলা হয়েছেন মিস্টার কলিনস।'

'আর শুধু ওই পঞ্চাশ হাজারই নয়,' আরও জানালো ডিক। 'সিংহটার জন্যে আলাদা ভাড়া দেবে সিন। প্রতিটি দৃশ্যের জন্যে পাঁচশো ডলার করে।'

'ভিকটর কি আগে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে? কাউকে জখম-টখম করেছে?'

'না,' মাথা নাড়লো ডিক। 'কখনও না। এমনিতে বেচারা খুব শান্ত, ভালো ট্রেনিং পাওয়া,' ঠোঁট কামড়ালো সে। 'তবে ইদানীং অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে। দেখলেই তো তখন।'

'আগে না করলে এখন করে কেন?' রবিন বললো। 'কিসে, কেন নার্ভাস হয়েছে সে, কোনো ধারণা দিতে পারো?'

'ঠিক বলতে পারবো না, তবে কিছুদিন ধরে ভালো ঘুম হচ্ছে না তার। অস্থির থাকে। রাতে থেকে থেকেই উঠে গর্জায়, পায়চারি করে, বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মাঝেসাঝে চাচার কথাও শুনতে চায় না।'

'ঘরের বাইরের কোনো কিছু উত্তেজিত করে তাকে?' প্রশ্ন করলো কিশোর। 'রাতের অন্ধকারে বাইরে তো কতোরকম জানোয়ারই ঘুরে বেড়ায়।'

'না, সেজন্যে না,' জোরে মাথা নাড়লো ডিক। 'হরিণ যা আছে, রাতে ছাড়া থাকে না, নির্দিষ্ট ঘরে আটকে রাখা হয়। ঘোড়াগুলোকে রাখা হয় কোরালে। দুটো হাতি আছে আমাদের, দিনে বেশির ভাগ সময়ই হ্রদের ধারে থাকে, রাতে থাকে ওদের ঘরে। এছাড়া র‍্যাকুন আছে, বানর, পাখি, কুকুর, আর আরও নানারকম জানোয়ার আছে। পাখি আর বানর ছাড়া প্রায় কোনো জানোয়ারই রাতে ছাড়া থাকে না। গুণে গুণে ঢোকানো হয় যার যার খাঁচায়।'

'তাহলে কি কারণে নার্ভাস হয় সিংহটা?' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'কারণ তো একটা নিশ্চয় আছে।'

'এতোটাই নার্ভাস যে জন প্রাইসকে আক্রমণ করে বসেছে,' কিশোরের কথার পিঠে বললো মুসা। 'তবে প্রাইসও নাকি লোক সুবিধের নয়। বাবার মুখে শুনেছি। ব্যবহার-ট্যবহার খুব খারাপ।'

'লোকের সংগে ব্যবহার খারাপ করা এক কথা,' রবিন বললো, 'আর সিংহের সংগে করা আরেক কথা। যেমন কর্ম তেমন ফলই হয়তো পেয়েছে।'

'সবই আমাদের অনুমান,' কিশোর বললো, 'শিওর হয়ে বলা যাচ্ছে না কিছুই। অন্য কোনো জানোয়ারের আক্রমণেও আহত হতে পারে...'

'গরিলা!' বাধা দিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ডিক।

'গরিলা? গরিলাও আছে নাকি এখানে?'

'ছিলো না। তবে দু'একদিনের মধ্যে আসার কথা ছিলো। হয়তো এসে গেছে, আমরা জানি না। এবং কোনোভাবে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হামলা চালিয়েছে প্রাইসের ওপর। হতেই পারে।'

হাত তুললো কিশোর। 'আবার সেই অনুমান। কোনোভাবে বেরিয়েছে বলছো। সেই কোনোভাবেটা কিভাবে? খাঁচায় তালা থাকে না?'

মাথা ঝাঁকালো ডিক, 'ঠিকই বলেছো। আসলে···আমিও বোধহয় ভিকটরের মতো নার্ভাস হয়ে পড়ছি। গরিলার কথা চাচা বলেনি আমাকে। এলে নিশ্চয় জানতো, বলতোও; আর সত্যিই তো নতুন জীব এলে সেটার বেরোনো···যদি না···যদি না···'

'যদি না, কী?'

'যদি না কেউ খুলে দেয়। এমন কেউ, যে আমার চাচাকে দেখতে পারে না।'

আট

কাজ সেরে বিকেলেই ফিরে এলো রোরিস। তিন গোয়েন্দাকে গাড়িতে তুলে নিলো। চললো স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে। ডিককে কথা দিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা, খুব শিগগিরই আবার জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আসছে ওরা।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালালো ছেলেরা।

রবিন বললো, 'একজনের ওপরই বেশি সন্দেহ পড়ছে, টোন কিন। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে, শোধ নেয়ার জন্যেই হয়তো এসব করছে। অঘটন ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সিন লোকটাকে অবশ্য ভালো লাগেনি আমার। তবে তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। সে ক্ষতি করতে চাইবে কেন? শূটিঙে দেরি হলে, তারই ক্ষতি।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা। 'শুনেছি, কিছু কিছু কোম্পানির বাজেট খুব কম থাকে, সময়ও কম। তাছাড়া জাঙ্গল ল্যাণ্ডে যতো বেশি দিন শূটিং করবে, ততো বেশি ভাড়া গুণতে হবে। জেনেশুনে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে যাবে কেন সে? কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

'সঠিক কিছুই বলা যায় না এখন,' ধীরে ধীরে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কিন করে থাকতে পারে।'

'আসল কাজের কিন্তু কিছুই হলো না। আমরা গিয়েছিলাম একটা সিংহ কেন নার্ভাস হয়েছে, সে-ব্যাপারে তদন্ত করতে।'

'তা ঠিক। শুধু জেনেছি, কেউ ওকে ঘর থেকে ছেড়ে দিয়েছে। পা কেটেছে। তবে ওই কাটা কিছু প্রমাণ করে না। কিভাবে কেটেছে কে জানে!'

'আমার তো এখন মনে হচ্ছে, পশু চিকিৎসক দিয়ে হবে না। ওই সিংহের রোগ সারাতে হলে সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার।'

চললো আলোচনা।

ইয়ার্ডে পৌঁছুলো গাড়ি।

নামলো ছেলেরা। হেডকোয়ার্টারের দিকে চললো। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কিশোর। চোখে বিস্ময়। 'আরি, গেল কই!'

'কি গেল কই?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'লোহার শিকগুলো! সব বেচে দিয়েছে?'

ঘাড় চুলকালো রবিন, সে-ও অবাক। 'এতোগুলো মরচেপড়া শিকের দরকার হলো কার?'

'আল্লাহই জানে,' হাত নাড়লো মুসা। 'রাশেদ চাচার কপাল খুলেছে আরকি।'

মেরিচাচীকে আসতে দেখা গেল। কাছে এলে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'চাচী, শিকগুলো কোথায়?'

'নিয়ে গেছে,' হাসিমুখে বললেন মেরিচাচী। 'একটা লোক এসেছিলো। ট্রাক বোঝাই করে সব কিনে নিয়ে গেছে।'

'চাচা কই?'

'কাটতি দেখে আরও শিক আনতে গেছে। রোভারকে নিয়ে গেছে, বড় ট্রাকে করে।'

'লোকটা আরও শিক নেবে নাকি? বলেছে কিছু?'

'বলেনি, তবে যেরকম আগ্রহ দেখলাম, আরও নিতে এলেও অবাক হবো না।' তিন কিশোরের উত্তেজিত শুকনো মুখের দিকে তাকালেন। 'এই, মুখচোখ এমন শুকনো কেনরে? খাসনি কিছু? স্যাণ্ডউইচ আছে, জলদি গিয়ে খেয়ে নে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। অফিস সামলাস।'

রান্নাঘর থেকে স্যাণ্ডউইচ আর ফ্রিজ থেকে কমলার রসের বোতল বের করে নিয়ে এসে অফিসে বসলো তিনজনে।

ইয়া বড় বড় গোটা পাঁচেক স্যাণ্ডউইচ শেষ করার আগে একটা কথাও বললো না মুসা। তারপর ঢকঢক করে দুই বোতল কমলার রস খেয়ে ঢেকুর তুললো, 'আহ্, বাঁচলাম। নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছিলো।...তা ভাই, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আবার কবে যাচ্ছি আমরা?'

'পারলে কালই,' বললো কিশোর। 'আজ তো কিছুই জানতে পারিনি, দেখিওনি

তেমন কিছু। অনেক কিছু দেখার আছে। রাতে রহস্যজনক কিছু ঘটে ওখানে। যে কারণে নার্ভাস হয়ে পড়ে সিংহটা।' রসটুকু শেষ করে বোতলটা ঠক করে নামিয়ে রাখলো টেবিলে। 'নানা কারণে অস্থির হয় জন্তুজানোয়ার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইঙ্গিত পেলে হয়···কিন্তু ঝড়-টরের তো নামগন্ধও নেই এখন। তাহলে কিসে নার্ভাস করলো?'

'আরও একটা ব্যাপার,' রবিন মনে করিয়ে দিলো। 'টোন কিন আমাদের সংগে অভিনয় করলো কেন? কেন বললো না সে উইলবার কলিনস নয়?'

'জানি না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো? সিংহটা কিন্তু আগে থেকেই গর্জন করছিলো। মানে কিনের সংগে আমাদের দেখা হওয়ার আগে থেকেই। এমনও তো হতে পারে, জখমটা কিন করেনি। নাহ্, গাধার মতো গিয়ে খামোখা ঘুরে এলাম। এরপর গেলে চোখকান খোলা রাখতে হবে। অনেকগুলো রহস্য জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

গেটের দিকে চোখ পড়তে মুসা বললো, 'কে জানি আসছে।'

বাদামী রঙের একটা স্যালুন গাড়ি ঢুকলো ইয়ার্ডে। অফিসের সামনে এসে থামলো। একজন লোক নামলো, মাথায় চুল খুব পাতলা। ইয়ার্ডের জঞ্জালের ওপর চোখ বোলালো। তারপর এগিয়ে গেল একদিকে। একটা জিনিস ধরে ভালোমতো দেখলো। সন্তুষ্ট হয়ে রেখে দিয়ে রুমালে হাতের ধুলো মুছে এগিয়ে এলো অফিসের দিকে।

দরজায় বেরিয়ে এসেছে কিশোর। পেছনে তার দুই সঙ্গী।

কোমর সরু, চওড়া কাঁধ লোকটার। পরনে বিজনেস সুট, গলায় বো-টাই। ফ্যাকাসে নীল চোখের তারা, অনেকটা কোদালের মতো চোয়াল—চেহারার সর্বনাশ করে দিয়েছে। মুসা তো মনে মনে নামই দিয়ে ফেললো, 'কোদালমুখো'।

'কিছু লোহার শিক দরকার,' বললো লোকটা। বলার ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব, আদেশ দিতে অভ্যস্ত বোঝা যায়। 'মালিক কোথায়?'

'বাইরে গেছে, স্যার,' তুখোর সেলসম্যানের মতো বিনীত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'আপনার যা যা দরকার, আমাকে বলতে পারেন। কিন্তু, শিক তো দিতে পারবো না, স্যার, নেই। সরি। যা ছিলো সব বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কে কিনেছে? কখন?'

'আজ সকালে। কে নিয়েছে, বলতে পারবো না, স্যার তখন ছিলাম না।'

'কেন, বিক্রির রেকর্ড রাখো না?'

'পুরনো মাল বিক্রির আর রেকর্ড কি রাখবো, স্যার? লোকে আসে, পছন্দ করে, দাম দিয়ে নিয়ে যায়। ব্যস। ঝামেলা শেষ।'

'আই সী,' হতাশ হয়ে আবার পুরনো লোহালক্কড়ের দিকে তাকালো লোকটা।

'ইয়ার্ডের মালিক আমার চাচা,' লোকটার হতাশা দেখে বললো কিশোর। 'আরও শিক আনতে গেছে। নামঠিকানা রেখে যান, এলেই আপনাকে খবর দেবো।'

কিশোরের কথা যেন শুনতেই পায়নি লোকটা, জঞ্জালের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বললো, 'এখন একটাও নেই? ছোটবড় যা হোক?'

'কি ধরনের জিনিস খুঁজছেন, স্যার, বুঝিয়ে বললে চেষ্টা করতে পারি। দেখি কিছু দিতে পারি কিনা।'

'ওগুলো কি?' হাত তুলে দেখালো লোকটা। 'জানোয়ারের খাঁচা? ওগুলোতে তো শিক আছে।'

'তা আছে। কিন্তু ওগুলো দিয়ে কি করবেন? দেখছেনই তো পুরনো, ভাঙা। মেরামত করতে সময় লাগবে···'

বাধা দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো লোকটা, 'ওই শিক হলেই চলবে আমার। কতো?', পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো লোকটা।

চোখ মিটমিট করলো কিশোর। 'শুধু শিক চাইছেন? আস্ত খাঁচা নয়?'

'না। কতো?'

চেহারা দেখেই বোঝা যায়, গভীর ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। 'সরি, স্যার। ওগুলো এখন বিক্রি হবে না। চাচা বলেছে, আগে মেরামত হবে, তারপর বেশি দামে বিক্রি করা হবে সার্কাস পার্টির কাছে।'

হাসলো লোকটা। 'বেশ তো। মেরামত করে যে দামে বিক্রি করবে, এখনই তা-ই নিয়ে নাও আমার কাছ থেকে।'

কিছু মনে করবেন না, স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি কি সার্কাসের লোক?'

'না হলে ক্ষতিটা কি?' বললো লোকটা। 'আমি খাঁচাগুলো চাইছি, তার জন্যে যা দাম লাগে দেবো। ব্যস, চুকে গেল। জলদি বলো, কতো দাম। তাড়া আছে আমার।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খাঁচাগুলোর দিকে তাকালো কিশোর। চারটে। এতো ভাঙাচোরা, মেরামত করেও পুরোপুরি ঠিক করা যাবে কিনা সন্দেহ। 'এক হাজার ডলার, স্যার,' ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললো সে।

মানিব্যাগে শক্ত হলো লোকটার আঙুল। 'ওই জঞ্জালগুলোর দাম এক হাজার! ঠাট্টা করছো নাকি? আছে কিছু ওগুলোর, ভালো করে চেয়ে দেখো?'

পেছনে নড়েচড়ে উঠলো দুই সহকারী পোয়েন্দা। ছোট্ট কাশি দিয়ে অহেতুক গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করলো মুসা। আসলে কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

ফিরেও তাকালো না কিশোর। 'সবগুলো এক হাজার নয়, স্যার,' বিনীত কণ্ঠস্বর, 'একেকটার দাম এক হাজার। তারমানে চারটের দাম চার হাজার।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লোকটা। মানিব্যাগটা ভরে রাখলো পকেটে। 'অযথাই তোমাকে বসিয়ে গেছে তোমার চাচা। ব্যবসার কিচ্ছু বোঝো না। চারটে নতুন খাঁচার দাম কতো, জানো?'

'তাহলে নতুনই কিনে নিলে পারেন, স্যার? ঠিক আছে, এক কাজ করেন, আপনি আবার আসেন একটু পরে! ততোক্ষণে চাচা হয়তো চলে আসবে।'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। আবার মানিব্যাগ বের করে একটা বিশ ডলারের কড়কড়ে নোট বেছে নিলো। কিশোরের নাকের কাছে ওটা নেড়ে বললো, 'এই যে, বড়জোর এই দিতে পারি। বিশ ডলার।'

দ্বিধা করছে কিশোর। পুরনো ভাঙা ওই খাঁচাগুলোর দাম বিশ ডলারের অনেক কম, জানে সে। দিয়ে দেবে নাকি? 'সরি। পারলাম না, স্যার।'

নয়

'ঠিক আছে, খোকা,' কঠিন, শীতল কণ্ঠে বললো কোদালমুখো, 'আমি আবার আসবো।'

গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

'করেছো কি, কিশোর?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'ওই জঞ্জালের দাম চার হাজার ডলার?' মুসাও চেঁচালো। 'বিশ ডলারই তো অনেক বেশি। শিওর, আজ রাশেদচাচার বকা খাবে তুমি।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'জানি। পাঁচ ডলারও লাগেনি চাচার কিনতে।'

'তাহলে?' রবিন বললো। 'লোকটাকে সুবিধের মনে হলো না। তাকে ওভাবে বিদেয় করে ভালো করোনি। নিরাশ হয়েছে খুব।'

'অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছিলো তো,' বললো কিশোর। 'তাই ভাবলাম, চাপ দিয়ে দেখিই না, কতোখানি ওঠে। কতোটা দরকার?'

'এখন তো জানলে,' বললো মুসা। 'বিশ ডলার। মেরিচাচী এসে শুনলে আজ রাতের খাওয়া বন্ধ করে দেবে তোমার।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে অফিসে ফিরে এসে বসলো কিশোর। 'দেখা যাক কি হয়।'

আবার এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ইয়ার্ডের ট্রাক ফিরে এসেছেন রাশেদ পাশা। খালি ট্রাক। শিক, খাঁচা কিচ্ছু নেই পেছনে।

অফিস থেকে বেরোলো ছেলেরা।

'কি ব্যাপার, চাচা,' জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কিচ্ছু পাওনি?'

লম্বা গোঁফের ডগা টানলেন রাশেদ পাশা। পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরে রেখে বললেন, 'নাহ্। পুরনো শিকের জন্যে যেন পাগল হয়ে উঠেছে লোকে। যা ছিলো, তখন দেখে এসেছিলাম, সব নিয়ে গেছে। একটাও নেই।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। 'আমাদের এখানে যা ছিলো, তা-ও সব বেচা শেষ। এইমাত্র আরেকজন কাস্টোমার গেল।'

'তাই নাকি? ভুলই করে ফেলেছি। তখনই সব নিয়ে আসা উচিত ছিলো।'

অস্বস্তিভরে পা নাড়লো কিশোর, এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করলো। 'চাচা, লোকটা ওই খাঁচাগুলো চাইছিলো। কেনার জন্যে খুব চাপাচাপি করলো।'

ভাতিজার মুখের দিকে তাকালেন চাচা। 'ওই ভাঙা খাঁচা? কতো দাম বললো?'

'বিশ ডলার।'

'বিশ ডলার?' গম্ভীর হলেন রাশেদ পাশা। 'দিলি না কেন?'

'বললাম, অনেক কম দাম বলেছে।'

ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়লেন চাচা। 'তুই কতো চেয়েছিলি?'

লম্বা দম নিলো কিশোর। 'এক হাজার ডলার।' বোম কাটার আশায় চুপ রইলো এক মুহূর্ত। কিন্তু জবাবে বেরোলো আরও কিছু ধোঁয়া। 'একেকটার জন্যে এক হাজার। চারটের জন্যে চার হাজার।'

দাঁত থেকে পাইপ হাতে নিলেন রাশেদ পাশা। বকা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে কিশোর, এই সময় গেটে আবার শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। বাদামী স্যালুনটা ফিরে এসেছে।

'ওই যে, ওই লোক,' বললো কিশোর।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলো কোদালমুখো। রাশেদ পাশাকে বললো, 'আপনি ইয়ার্ডের মালিক?'

'হ্যাঁ,' বললেন চাচা।

'আমার নাম ডেইমিং।' আঙুল দিয়ে বাতাসে খোঁচা মেরে কিশোরকে দেখালো সে, 'ওটাকে বসিয়ে গিয়েছিলেন কেন? কিচ্ছু জানে না। কয়েকটা পুরনো খাঁচার জন্যে ও আমাকে জবাই করতে চেয়েছিলো।'

'তাই নাকি? সরি।'

হাসি ফুটলো কোদালমুখোর মুখে। 'আমি জানতাম, তা-ই বলবেন আপনি।', পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বিশ ডলারের একটা নোট দিলো। 'ওকে দিতে চেয়েছিলাম, নিলো না।'

খাঁচাগুলোর দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'আপনি তো চাইছেন শিক, তাই না?

ওগুলো খাঁচা।'

'খাঁচা থেকেই খুলে নেবো,' অধৈর্য হয়ে বললো ডেইমিং। শিক দিয়েই খাঁচা বানানো হয়। এই যে নিন, বিশ ডলার।'

নিভে যাওয়া পাইপ ধরালেন রাশেদ পাশা। জোরে জোরে টেনে ধোঁয়া ছাড়লেন।

অপেক্ষা করছে কিশোর।

উসখুস করছে লোকটা।

'সরি, মিস্টার,' অবশেষে বললেন রাশেদ পাশা, 'আমার ভাতিজা দাম চেয়ে ভুল করে ফেলেছে। খাঁচাগুলো সার্কাস পার্টির কাছে বেচবো আমি। আর কারো কাছে নয়।'

স্তব্ধ হয়ে চাচার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

হাঁ হয়ে গেছে রবিন আর মুসা।

'সার্কাস পার্টি?' ভুরু কোঁচকালো লোকটা।

'হ্যাঁ। ওগুলো জানোয়ারের খাঁচা। মেরামত করে সার্কাস পার্টির কাছে বেচবো। ছেলেমানুষ তো, ভুল করে ফেলেছে।'

'ভুল মানে! কতো দাম চেয়েছে একেকটার জানেন? এক হাজার ডলার।'

'হ্যাঁ, বলেছে।'

হাসলো ডেইমিং। 'আপনার ভালো দামে বিক্রি হওয়া দিয়ে কথা। সার্কাস পার্টির কাছেই বেচুন, আর যার কাছেই বেচুন। আমি কি কম দিচ্ছি?'

'আসলে,' আবার ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ পাশা, 'সার্কাসের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে আমার। তাছাড়া বললামই তো, ভাতিজা কম চেয়ে ফেলেছে। একেকটা খাঁচার দাম হওয়া উচিত দেড় হাজার ডলার। তারমানে চারটের দাম ছয় হাজার।'

পাথর হয়ে গেল যেন লোকটা। ইয়ার্ডের মালিকের মুখে কোনোরকম রসিকতার ভাব দেখতে পেলো না। নীরবে পাইপ টেনে চলেছেন, নিয়মিত ধোঁয়া ছাড়লেন। কেউ কিছু বলছে না, পিনপতন নীরবতা। ভালো জমেছে নাটক।

এই সময় বেরসিকের মতো সেখানে এসে হাজির হলো রোভার, 'বস, ওখানে জঞ্জাল জমে আছে। সাফ করে ফেলবো?'

বিশালদেহী রোভারকে দেখলো এক পলক কোদালমুখো, আরও শীতল হলো চাহনি। 'ঠিক আছে, মিস্টার,' খসখসে কণ্ঠে বললো সে, 'আপনার জিনিস, আপনি যতো খুশি দামে বেচুন। আমার টাকার দাম আমার কাছে।'

চলে গেল বাদামী লুস্যান।

কিশোরের ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চাচাকে।

মিনিট কয়েক পর।

হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা।

'রাশেদচাচা কাণ্ডটা করলো কি!' টুলে বসতে বসতে বললো রবিন।

'ছয় হাজার ডলার!' মুসা বললো।

'আমিও অবাক হয়েছি,' মাথা দুলিয়ে বললো কিশোর। 'কি জানি কেন করেছে। সার্কাসকে ভালোবাসেতো। তাই হয়তো লাভের কথা ভাবেনি। পনেরো ডলার নাহয় গেলই। তার পছন্দের জায়গায় বিনে পয়সায়ই হয়তো দান করে দেবে।'

'কিন্তু হঠাৎ করে লোহার শিক আর খাঁচার জন্যে খেপে উঠলো কেন লোকে?' রবিনের প্রশ্ন।

মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কিশোর, এই সময় বাজলো টেলিফোন।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো কিশোর। লাইনের সংগে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করে দিলো। 'হালো। কিশোর পাশা।'

'কিশোর,' বেজে উঠলো স্পীকারে, 'আমি। আমি ডিক কলিনস। আজ রাতে আসতে পারবে?'

'আজই? ঠিক বলতে পারছি না। এতো তাড়াহুড়ো কেন? কিছু হয়েছে?'

'না। ভাবলাম, গরিলাটা এসেছে তো, তোমরা হয়তো দেখতে চাইবে।'

'তাই নাকি? খুব বড়?'

হাসলো ডিক। 'অনেক বড়। সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের। ঘরেই রাখতে চাইছি। কিন্তু ওখানে তো ভিকটরও থাকবে। তার তো আবার মেজাজ খারাপ। কি করে বসে কে জানে।'

'হ্যাঁ। অন্ধকারে তো আবার নার্ভাস হয়ে যায় সিংহটা।'

'এইই সুযোগ তোমাদের জন্যে। এলে আজ রাতেই হয়তো জানতে পারবে কেন হয়।'

'দেখি, চেষ্টা করবো। গাড়ি যদি পাই।'

'কেন, তোমাদের গাড়িই তো আছে।'

'রাতে পাওয়া যাবে না। আই মীন, ড্রাইভার পাওয়া যাবে না। দিনে খাটে বোরিস আর রোভার, মানে, আমাদের কর্মচারীরা। রাতে ওদের কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। দেখি, রোলস রয়েসটা জোগাড় করতে পারি কিনা।'

'রোলস রয়েস!'

'হ্যাঁ, সংগে শোফারও আছে। গাড়ি পেলে আজ রাতেই আসবো। তুমি কোথায় থাকবে?'

রাত ন'টায় জাঙ্গল ল্যাণ্ডের গেটে পৌঁছলো রোলস রয়েস।

জানালা দিয়ে মুখ বের করলো কিশোর। 'এখানেই তো ডিকের থাকার কথা।'

গেটের ওপরে উজ্জ্বল একটা আলো আশপাশের অনেকখানি জায়গা আলোকিত করে রেখেছে। তার পরে পুরো বনভূমি অন্ধকার। রাতের বাতাসে সড়সড় করছে পাম গাছের পাতা। ভেসে আসছে বিচিত্র কিচিরমিচির।

গাড়ি থেকে নেমে গেটের পাল্লা খুলে দিলো মুসা। রোলস রয়েস ভেতরে ঢুকলে পাল্লা আবার বন্ধ করে দিয়ে এসে উঠে বসলো। 'কেমন জানি জায়গাটা!' নিচু কণ্ঠে বললো সে। 'গা ছমছম করে।'

পথ আর জায়গা চিনে রাখার ব্যাপারে মুসা ওস্তাদ। একবার যেখান দিয়ে যায়, সহজে ভোলে না। অন্ধকারেও চিনে ফেলে কি করে যেন, তার এই ক্ষমতা অনেক সময় কিশোর পাশাকেও বিস্মিত করেছে। পথ দেখালো এখন মুসা। ড্রাইভ করে চললো হ্যানসন।

বড় শাদা বাড়িটা দেখা যেতেই শোফারের কাঁধে হাত রাখলো মুসা, 'এক মিনিট।'

ভুরু তুললো কিশোর। 'কি ব্যাপার, মুসা?'

'চিৎকার শুনলাম মনে হলো।'

চুপ করে বসে কান পেতে রয়েছে ওরা। খানিক পরেই বনের ভেতর থেকে শোনা গেল শব্দ। তারপর, দূরে শোনা গেল সাইরেনের তীক্ষ্ণ বিলাপের মতো শব্দ।

হাত তুলে বললো রবিন, 'দেখো দেখো, সার্চলাইট!'

সবাই দেখলো, অন্ধকার আকাশে বাঁকা রেখা সৃষ্টি করে সরে যাচ্ছে সার্চলাইটের তীব্র নীলচে-শাদা আলোকরশ্মি। সামনে ঝোপঝাড়ের ভেতরে শোনা গেল দুপদাপ শব্দ। ভারি নিঃশ্বাস, হাঁপাচ্ছে কেউ। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি। রোলস রয়েসের হেডলাইটের আলোর সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট।

'টোল কিন!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

'কিসে তাড়া করেছে!' মুসা বললো। 'ব্যাপারটা কি?'

হুড়মুড় করে পথের অন্যপাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো লোকটা। ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল তার ছুটে চলার আওয়াজ।

সামনে রাগান্বিত চিৎকার শোনা গেল। টর্চের আলো দেখা গেল।

'কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে,' আন্দাজ করলো রবিন।

'চলো তো দেখি,' কিশোর বললো।

গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলো তিন গোয়েন্দা।

তাদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলো কেউ।

ফিরে চাইলো কিশোর। দ্বিধা করছে।

একটা টর্চের আলো নেচে উঠলো। 'কিশোর, আমি। ডিক।'

কাছে গেল তিন গোয়েন্দা।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ডিক। তার পেছনে আরও কয়েকজন, টর্চ হাতে কি যেন খোঁজাখুজি করছে। এদিক ওদিক আলো ফেলছে। গাছের ডালেও ফেলছে কেউ কেউ। কয়েকজনের হাতে রাইফেল।

'হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'আবার পালিয়েছে ভিকটর?'

'না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিক। 'তার চেয়েও বড় বিপদ।'

'কী?' অধৈর্য কণ্ঠে বললো রবিন। 'হাতে রাইফেল কেন ওদের? টোল কিনকে খুঁজছে?'

'কে?'

'টোল কিন,' জবাব দিলো মুসা। 'এই তো, এইমাত্র দেখলাম ওকে। এদিক থেকে বেরিয়ে ওদিকে ঢুকে পড়েছে।'

'তা-ই বল!' গম্ভীর হলো ডিক। 'আমি এটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কিসের সন্দেহ?' রবিন আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'কি হচ্ছে এখানে?'

'গরিলা। খাঁচা থেকে পালিয়েছে।'

'কখন?' জানতে চাইলো মুসা। ভয়ে ভয়ে তাকালো এদিক ওদিক। 'তারমানে এই বনে এখন একটা বুনো গরিলা ছাড়া রয়েছে!'

'খানিক আগের ঘটনা। ডাক্তার হ্যানোয়েল তখন মাত্র ভিকটরকে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে।'

'একটা বুনো গরিলা, আর একটা নার্ভাস সিংহ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'ডিক, এমনও তো হতে পারে, গরিলাটাকে দেখে রাগারাগি করেছে ভিকটর। গর্জন করেছে। তাতে ভয় পেয়ে খাঁচার দরজা খুলে পালিয়েছে গরিলাটা।'

'দরজা খোলেনি।'

'তাহলে?'

'কেউ শিক খুলে দিয়েছে,' এক মুহূর্ত চুপ রইলো ডিক। তিক্তকণ্ঠে বললো, 'টোল কিন ছাড়া আর কেউ না, আমি শিওর।'

দশ

মাথা নাড়লো কিশোর। 'সে না-ও হতে পারে। অনেক কারণেই বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে টোল কিন। ও-ই করেছে, প্রমাণ করতে পারবে?...খাঁচাটা

একবার দেখা যায়? হয়তো কোনো সূত্র–টুত্র…'

'এসো,' পা বাড়াতে গিয়েও থামলো ডিক। 'রোলস রয়েসের কথা বললে। গাড়িটা কোথায়?'

'পাহাড়ের গোড়ায়,' জবাব দিলো রবিন। 'অসুবিধে নেই। শোফার আছে। গাড়িতেই বসে থাকবে।'

বাড়ির পাশের একটা খোলা জায়গায় ছেলেদের নিয়ে এলো ডিক। প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলছে। আলোকিত হয়ে আছে আশপাশের এলাকা। বড়, শূন্য খাঁচাটা দেখালো ডিক। 'তোমরা আজ বিকেলে যাওয়ার পর এসেছে। দুটো খাঁচা এসেছে এবার…'

'দুটো খাঁচা?' কিশোরের প্রশ্ন।

পেছনে চাপা একটা গর্জন হতেই চমকে ফিরে তাকালো সে। রবিন আর মুসাও ফিরেছে।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কি ওটা?'

বাড়ির কোণে টর্চের আলো ফেললো ডিক। 'দারুণ দেখতে। না?'

মাত্র বিশ ফুট দূরে রয়েছে জীবটা। ওরা ওটার দিকে এগোতেই গররর করে উঠলো।

'কালো প্যান্থার,' বললো ডিক। 'চিতাবাঘ।'

মোটা লোহার শিকে তৈরি খাঁচার ভেতর থেকে জ্বলন্ত হলুদ চোখে ওদের দেখছে চিতাবাঘ। ওরা আরও এগোতেই হিসিয়ে উঠলো। মুখ হাঁ করতে দেখা গেল ঝকঝকে শাদা ভয়াল শ্বদন্ত।

'আরিব্বাপরে! পেশী দেখেছো!' মুগ্ধ চোখে জানোয়ারটাকে দেখছে মুসা। 'আমাজানের জঙ্গলে আমরা যে জাগুয়ারটাকে ধরেছিলাম. [illegible]র [illegible] য় কম না।'

মুসার কথার জবাবেই যেন গর্জে উঠে খাঁচার শিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো চিতাটা। ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

'এটা জাগুয়ার নয়,' জানালো ডিক। 'প্যান্থার, খাঁটি চিতাবাঘ। আফ্রিকান।'

অস্থিরভাবে খাঁচার ভেতরে পায়চারি শুরু করলো চিতাবাঘ।

'মেজাজ খুব খারাপ মনে হচ্ছে।' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো রবিন। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

কিশোর চেয়ে আছে আরেকদিকে, শূন্য খাঁচাটা দেখছে, যেটাতে গরিলা ছিলো। এগিয়ে গেল ওটার কাছে। ভালোমতো দেখে সোজা হলো। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোলো মুখ থেকে।

'কি ব্যাপার, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'খাঁচায় গোলমাল,' ঘোষণা করলো কিশোর। 'ডিক ঠিকই বলেছে। কেউ

গরিলাটাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

'কি করে বুঝলে?' এগিয়ে এলো মুসা।

খাঁচার একধার দেখালো কিশোর। 'দেখেছো? একটা শিক খুলে নেয়া হয়েছে। পাশের দুটো বাঁকানো। প্রতি দুটো শিকের মাঝে ফাঁক ছয় ইঞ্চি। একটা কেউ খুলে নিয়েছে। ফাঁক বেশি হয়ে যাওয়ায় অন্য দুটোতে চাপ দেয়ার সুযোগ পেয়েছে গরিলাটা। ফাঁক করে বেরিয়ে গেছে। ডিক, গরিলাটা কতো বড়?'

'বয়েস বেশি না, তবে গায়েগতরে বড়ই। প্রায় আমাদের সমান।'

'হুঁ। তারমানে দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে গায়ের জোর বেশি। আনা হয়েছে কোত্থেকে?'

'মধ্য আফ্রিকার রুয়াণ্ডা। অনেকদিন থেকেই আশায় ছিলাম, একটা গরিলা পাবো। সিলভার চাচাও অনেক চেষ্টা করেছে। কঙ্গো, উগাণ্ডা রুয়াণ্ডায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। শেষে রুয়াণ্ডা থেকে চিঠি লিখেছে আমাদেরকে, একটা গরিলা পাওয়া গেছে, তবে ওদেশ থেকে বের করার অসুবিধে। সরকারী বিধিনিষেধ। ওদের বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে চাচাকে।'

'গরিলা তো অনেক জাতের আছে,' রবিন বললো। 'তোমাদের এটা কোন জাতের?'

'পাহাড়ী,' অন্ধকার থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠ। আলোয় এলেন উইলবার কলিনস। 'কম বয়েসী, মন্দা।'

'পাওয়া গেছে?' জানতে চাইলো ডিক।

মাথা নাড়লেন কলিনস। ক্লান্ত, মুখে ধুলোময়লা লেগেছে। 'মনে হয় খাদের ওদিকে চলে গেছে। গিয়ে দেখা দরকার।'

'জন প্রাইসের কি খবর?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। ভিকটরই মেরেছে ওকে?'

হাসলেন কলিনস। 'না। পাহাড় থেকে পিছলে পড়েছে। অযথাই আমাকে চাপ দিতে এসেছিলো সিন। হারামী লোক। এক ঝামেলা থেকে রেহাই পেলাম, এখন আরেক ঝামেলায় পড়েছি।'

দূরে হৈ-চৈ শোনা গেল।

'যাই, গিয়ে দেখি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন কলিনস। 'খারাপ কিছু ঘটানোর আগেই গরিলাটাকে ধরা দরকার।'

'কাজটা বিপজ্জনক, না?' মুসা বললো।

'কিছুটা তো বটেই,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

একটা হুড খোলা জীপ এসে থামলো। ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন ডাক্তার হ্যালোয়েন। কলিনস উঠে বসতেই আবার চলতে শুরু করলো জীপ।

মলিন হাসি হাসলো ডিক। 'ওই এক ডাক্তার। জন্তুজানোয়ারের পাগল।'

'এতোই যদি পাগল হবে,' মুসা ফস করে বলে ফেললো, 'গাড়িতে রাইফেল কেন?'

'ওটা রাইফেল না, স্টান গান। ডার্ট ছোঁড়ে, বুলেট নয়। বিশেষ ধরনের ডার্ট, ভেতরটা ফাঁপা, তাতে ঘুমের ওষুধ ভরা থাকে। রক্তে মিশলে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে জানোয়ার। ধরা সহজ হয় তখন।'

'ওঁরা গিয়ে গরিলা ধরুক,' কিশোর বললো। 'আমরা ততোক্ষণ আশপাশটা ঘুরে দেখি। জানোয়ারগুলো ছাড়া পায় কিভাবে, বোঝা দরকার। প্রথমে পালালো ভিকটর, তারপর এখন এই গরিলা।'

'ভিকটর এখন ভালো আছে,' ডিক জানালো। 'বাড়ির ভেতরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার। কাল সকালে শূটিঙে যেতে পারবে সিংহটা।'

চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। 'ভিকটরেরও খাঁচা আছে নাকি?'

'না। এক মাস আগেই ওর খাঁচা ফেলে দিয়েছি। এখন ঘরের ভেতরে চাচা আর আমার সংগে ঘুমায়। ওর নিজের ঘর আছে। কিন্তু আমাদের সংগে থাকতেই ভালোবাসে।'

আলোকিত বাড়িটার দিকে তাকালো কিশোর। 'একবার তো ছেড়ে দিয়েছে। আবার যদি দেয়?'

পকেট থেকে চাবি বের করলো ডিক। দেখালো। 'তালার ব্যবস্থা করেছি। শুধু দুটো চাবি, একটা চাচার কাছে, একটা আমার।'

'ডিক, তুমি বলেছো, রাতে অস্থির হয়ে ওঠে ভিকটর। এসো না, বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখি। কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

রাজি হলো ডিক। একটা টিলার ওপরের বন পরিষ্কার করে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। মূল বাড়ি থেকে খানিক দূরে একটা ছাউনি, তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর জ্বালানী কাঠ রাখা হয়। ইচ্ছে করলে গাড়িও রাখা যায় ওখানে, কিন্তু গাড়ি বাইরেই রাখেন কলিনস। টিলা থেকে উত্তর দিকে নেমে গিয়ে অন্য পথের সংগে মিশেছে একটা পথ।

শান্ত নিথর রাত। খানিক আগে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। চাঁদ উঠেছে। ঝকঝকে আকাশ, এক রত্তি মেঘ নেই।

পুরো বাড়িটা এক চক্কর ঘুরলো ওরা। ফিরে এলো আবার খাঁচাগুলোর কাছে। শূন্যই রয়েছে গরিলার খাঁচা। চিতাটা শুয়েছে বটে, ছেলেদের দেখে আবার সতর্ক হয়ে উঠলো। লেজ আছড়াতে শুরু করলো এপাশ ওপাশ।

'চলো, অন্য জায়গা দেখি,' প্রস্তাব দিলো কিশোর।

ডিককে অনুসরণ করে ঢালু পথ বেয়ে নামতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। হাঁটতে হাঁটতে জানালো, জাঙ্গল ল্যাণ্ডের কোথায় কি আছে।

'কতো বড়?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'আমার তো মনে হচ্ছে, এতো বেশি বড়, কোথায় কি ঘটছে বোঝাই মুশকিল তোমাদের জন্যে।'

'একশো একরের মতো,' বললো ডিক 'বড় এলাকা, ঠিকই বলেছো। তবে খোঁজ রাখতে, কই, আমাদের তেমন অসুবিধে হয় না।'

'কোন জায়গায় শূটিং করে সিন?'

'উত্তরে। এখান থেকে গাড়িতে পাঁচ মিনিটের পথ। এখন আমরা যাচ্ছি পুবে। আরেকটু পরেই আমাদের সীমানা শেষ।'

দুই ধারে ঝোপঝাড়, পাথর, বড় বড় গাছ। কোথাও মাথার ওপরে ডালপাতার চাঁদোয়া সৃষ্টি হয়েছে, ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে জ্যোৎস্না।

'তোমার চাচা যে খাদের কথা বললো, কোথায় ওটা? উত্তরে গেলেন বলেই তো মনে হলো।'

'হ্যাঁ। তবে কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে আরেকটা পথ পড়বে। উত্তর-পশ্চিমে গেছে। পনেরো মিনিটের পথ, তারপরে পাওয়া যাবে গিরিখাত। ওখানে কয়েক একর জমি আছে আমাদের। আফ্রিকান বন তৈরি করা হয়েছে ওখানে। হাতিগুলো ওখানেই থাকে।...ওই যে, ডাক শুনতে পাচ্ছো?'

জাঙ্গল ল্যাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে গেল ডিক, 'পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে টুরিস্ট সেকশন। আমাদের প্রধান আকর্ষণ আফ্রিকা আর জন্তুজানোয়ার, তবে বুনো পশ্চিমও পছন্দ অনেক দর্শকের। তাই ওদিকে একটা কৃত্রিম পশ্চিমা সীমান্ত-শহর তৈরি করেছি, নকল একটা গোরস্থান আছে, একটা গোস্ট টাউন আছে। এমনকি পুরনো দিনের ঘোড়ার গাড়িও আছে একটা, তাতে বাচ্চারা চড়ে।

'দক্ষিণে রয়েছে ঢোকার পথ, যেদিক দিয়ে এসেছো তোমরা। জঙ্গল বেশি ওদিকেই। মাঝখানে রয়েছে হ্রদটা, আর তারপরে, যেখানে সিন শূটিং করছে সেখানে রয়েছে আরও জঙ্গল। উত্তরে, শেষ মাথায় পাহাড়ের সারি। উঁচু উঁচু চূড়া আছে। আমাদের এখানে সিনেমার যতো শূটিং হয়, তার বেশির ভাগই হয় ওখানে। চূড়া থেকে নিচে ডাইভ দিয়ে পড়ে অভিনেতারা। ডাক্তারের ডিসপেনসারিও ওদিকেই।'

হঠাৎ পাখি আর বানর চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। থমকে গেল তিন গোয়েন্দা। ডিকের দিকে তাকালো।

'ও কিছু না,' বললো ডিক। 'প্রহর ঘোষণা করছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। নানারকম জন্তুজানোয়ার আছে আমাদের। সাপও আছে অনেক রকম। ওগুলোকে অবশ্য কড়া পাহারায় রাখতে হয়। খাঁচা থেকে ছাড়ি না। জঙ্গলে একবার ঢুকে গেলে আর খুঁজে বের

করা যাবে না।'

ডিকের কথা কিশোরের কানে যাচ্ছে বলে মনে হলো না। হঠাৎ পেছনে ফিরে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়িটা থেকে কতো দূরে এসেছি?'

'পাঁচশো গজ হবে। আরেকটু পরেই ঢালের শেষে বেড়া···'

'এই, চুপ!' দাঁড়িয়ে গেছে মুসা। 'কিসের শব্দ?'

সবাই শুনতে পাচ্ছে। ভোঁতা, অদ্ভুত একটা আওয়াজ। বাড়ছে শব্দটা। অনেকটা হাড় চিবানোর শব্দের মতো। তার সংগে যোগ হলো সাইরেনের মতো শব্দ, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হলো, বাড়ছে।

'আমার ভাল্লাগছে না,' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'চলো ফিরে যাই···'

কিশোরের কৌতূহল বেড়েছে। 'শব্দটা কিসের···'

কথা শেষ করতে পারলো না। তার আগেই শতগুণ বেড়ে গেল শব্দ। নানাধরনের শব্দের মিশ্রণ, বিশেষ কিছুর সাথে তুলনা করা কঠিন।

'চলো, পালাই!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নীরব হাসিতে ফেটে পড়লো ডিক।

'তুমি হাসছো!'

'হাসবো না? যা ভয় পেয়েছো। ওটা তো মেটাল শ্রেডার।'

এগারো

কমে এলো তীক্ষ্ণ শব্দ, হালকা শিস দিয়ে থেমে গেল। সাইরেনের মতোই।

'মেটাল শ্রেডার?' আনমনে বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

গাছপালার ভেতর দিয়ে একদিকে দেখালো ডিক, 'হ্যাঁ, কিশোর। বেড়ার ওধারে। আমাদের সীমানার বাইরে। একটা স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে। লোহালক্কড়ের জঞ্জাল। বেশির ভাগই পুরনো বাতিল গাড়ির বডি।'

'ওই শ্রেডার দিয়ে কি করে?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'লোককে ভয় দেখায়?'

'ওটা একধরনের মেশিন। গাড়ির শরীর কেটে টুকরো টুকরো করে। ধাতু থেকে ধাতুকে আলাদা করে। এই যেমন ধরো, গাড়ির বডিতে কতো রকমের ধাতুই থাকে, পিতল, লোহা, ইস্পাত···সব আলাদা আলাদা করে ফেলে। ওই ধাতুকে আবার নতুন করে কাজে লাগানো হয়।'

'মারছে!' হউফ করে নিঃশ্বাস ছাড়লো সহকারী গোয়েন্দা। 'চেনে কিভাবে? মানুষের ব্রেন লাগানো আছে নাকি?'

'অনেকটা ওরকমই। কম্পিউটার সিসটেম আছে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। হাতঘড়ির দিকে তাকালো। 'সাড়ে ন'টা। ডিক, ভিকটর কি এই সময়টাতেই নার্ভাস হয়?'

'আগেও হয়, পরেও হয়। ঠিক সময় বলতে পারবো না। অতোটা খেয়াল করে দেখিনি। তবে হয় অন্ধকার হওয়ার পরে।'

'সব সময় রাতে? দিনে কখনও না?'

'না।'

'কি ভাবছো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'ভাবছো, ওই মেটাল শ্রেডারের শব্দে নার্ভাস হয় সিংহটা?'

'শব্দ মানুষের চেয়ে জন্তুজানোয়ারকে অস্থির করে বেশি। হয়তো ভিকটর ওই শব্দ সইতে পারে না।'

'কিন্তু শুধু রাতে কেন?' যুক্তি দেখালো মুসা। 'দিনেও তো হয় শব্দ। তখন নার্ভাস হয় না কেন?'

'ভালো পয়েন্ট ধরেছো, সেকেণ্ড,' বললো কিশোর। 'ডিক ওই যন্ত্রটা দিনে চলে না?'

'মাঝেসাঝে। তবে সঠিক বলতে পারবো না। আমাদের বাড়ি থেকে আওয়াজ ততোটা শোনা যায় না তো…'

'হুম্‌ম্‌।' মাথা ঝোঁকালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'মেশিনটা বসেছে কদ্দিন?'

'নতুন। ইয়ার্ডটা অবশ্য পুরনো, কয়েক বছর ধরে আছে। শ্রেডারটা এসেছে মাসখানেক হলো।'

'এক মাস। তা ভিকটরের রোগটা শুরু হয়েছে কবে থেকে?'

'দু'-তিন মাস হবে। শুরুতে তেমন বেশি ছিলো না। তার অস্থিরতা বেড়েছে গত এক হপ্তায়।'

'তারমানে,' রবিন বললো, 'মেটাল শ্রেডার আসার আগেই তার রোগ হয়েছে।'

চিন্তিত মনে হচ্ছে কিশোরকে। 'তাহলে হয়তো বদ্ধ জায়গা পছন্দ করতে পারছে না ভিকটর, মানে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকাটা। কিংবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে।'

'সিনেমায় অভিনয়ের জন্যেও হতে পারে,' রসিকতা করে বললো মুসা। 'অনেক অভিনেতার হয় ওরকম। পরদিন শুটিং থাকলে আগের রাতে উত্তেজনায় ঘুমাতে পারে না। বাবার কাছে শুনেছি।'

'তা হয়,' বললো কিশোর। 'কিন্তু সেটা মানুষের বেলায়, সংলাপ মুখস্থ করতে হয় বলে। আরও নানা কারণ থাকে। সিংহের সে-সব ভাবনা নেই।' ডিকের দিকে ফিরলো। 'আচ্ছা, সিন এখানে এসেছে কতোদিন হলো?'

'মাস দুই হবে। মাস দেড়েক কাটিয়েছে লোকেশন সিলেকশন আর এটা ওটা করে। শূটিং শুরু করেছে এই হপ্তা দুই আগে থেকে।'

'রাতেও শূটিং করে?'

'করে মাঝে মাঝে।'

'মেটাল শ্রেডারের শব্দে অসুবিধে হয় না? মানে, ডায়লগ রেকর্ড করার সময় মাইকে ঢুকে যায় না ওই বিকট শব্দ।'

'তা হয়তো যায়। জানি না।'

'না, যায় না,' মুসা বললো। 'অনেক সময় শূটিং আগে হয়ে যায়। শব্দ, এমনকি ডায়লগও পরে যোগ করা হয়। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তা ঠিক। ডিক, অভিনেতা আর টেকনিশিয়ানরা থাকে কোথায়? শ্রমিকও তো আছে। তারা?'

'রাতে শূটিং না থাকলে প্রায় সবাই যার যার বাড়ি চলে যায়।'

'কারা কারা থাকে?'

'সিন। তার নিজের ট্রেলার আছে। আর থাকে অভিনেতা জন প্রাইস, আর অভিনেত্রী অ্যানি ফিশার। তাদেরও ট্রেলার আছে। সারা রাতই গেট খোলা থাকে। কে কখন আসে যায়, কি করে, এতোশতো খোঁজখবর রাখি না আমরা। রাখার প্রয়োজনও পড়ে না।'

'এমনও তো হতে পারে, ওই তিনজন ছাড়াও আরও কেউ থেকে যায় ভেতরে। রাতে এসে ঘুরঘুর করে তোমাদের বাড়ির আশপাশে। পারে না? তাতেই হয়তো চঞ্চল হয় ভিকটর।'

'কেন এরকম করবে কেউ, কিশোর?' কথাটা ধরলো রবিন।

'কেন করবে, সেটা এখন বলতে পারছি না। তবে করতেও তো পারে।'

'চলো, আরো ঘুরে দেখাই,' বললো ডিক। 'বেড়ার ধার দিয়ে আরেকদিকে চলে যাবো। এসো।'

ওরা বেড়ার কাছাকাছি আসতেই আবার শুরু হলো সেই অদ্ভুত বিকট শব্দ। ধাতু চিবিয়ে খাচ্ছে যেন কোন ভয়াল দানব।

'কি আওয়াজরে বাবা!' কানে আঙুল দিলো রবিন। 'এরপর এলে সংগে তুলো নিয়ে আসবো। তোমাদের সব জানোয়ারই যে নার্ভাস হয়নি এটাই আশ্চর্য।'

বেড়ার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। লোহার খুঁটি একটু পর পর পুঁতে তার গায়ে তারের জাল লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বেড়া। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। 'কদ্দুর পর্যন্ত আছে বেড়াটা?'

'উত্তরে চলে গেছে, একেবারে ইয়ার্ডের শেষ মাথা পর্যন্ত,' জানালো ডিক।

'তারপরে বড় একটা ড্রেনমতো আছে। সব জায়গায়ই বেড়াটা ছয় ফুট উঁচু, এখানে যেমন দেখছো। খুব শক্ত। কোনো জানোয়ার ভেঙে ওপাশে যেতে পারবে না।'

বেড়ার ধার ধরে উত্তরে এগোলো ছেলেরা। তারপর সরে এলো পাহাড়ের দিকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মুসা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

হাত তুলে দেখালো একদিকে মুসা। ফিসফিসিয়ে বললো, 'কি যেন শুনলাম?'

শ্রেডারের চিৎকার থেমে গেছে।

কান পাতলো অন্যেরাও।

'কই, কোথায়?' বললো কিশোর। 'আমি তো কিছু শুনছি না।'

আবার হাত তুলে দেখালো মুসা। 'ওদিকে।'

এইবার শুনতে পেলো সবাই। লম্বা ঘাসে ঘষার শব্দ। সেই সংগে ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ।

'ওই তো!' বলে উঠলো মুসা।

চাঁদের আলোয় ঘাসবনে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো সবারই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা।

বেরিয়ে এলো ওটা। কালো মাথা এপাশ ওপাশ নাড়ছে। ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না ওরা।

এগিয়ে আসছে জীবটা। ছাড়া পাওয়া সেই গরিলা।

বারো

সকলের আগে সামলে নিলো কিশোর। চেঁচিয়ে উঠলো, 'দৌড় দাও!'

মুহূর্ত দেরি করলো না, ঘুরেই ছুট লাগালো তিন গোয়েন্দা। ডিক দ্বিধা করছে। কর্তব্যবোধ। কিন্তু এগিয়ে আসা গরিলার লাল চোখ আর বিকট চেহারা দেখে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো, পিছু নিলো অন্যদের।

দমাদ্দম বুকে থাবা মারলো গরিলাটা, যেন ঢাক বাজালো। তারপর ঘুরে ঢুকে গেল আবার ঘাসবনে।

থামলো চার কিশোর।

'গেল কই?' হাঁপাচ্ছে রবিন।

'ঘাসের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে আবার,' ডিক জানালো। 'এখানে থাকাটা আর ঠিক না। চলো বাড়ি যাই।'

ফিরে চলেছে ওরা। বুকের ভেতরে দুরুদুরু কমেনি এখনও। খানিক দূর এগিয়ে মোড় নিয়েছে, ঠিক এই সময় ঘাস ফাঁক করে আবার বেরিয়ে এলো গরিলাটা। একেবারে তাদের মুখোমুখি। পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

ভয়ে জমে গেল যেন ছেলেরা।

মোটা, রোমশ দুই হাত মাথার ওপর তুলে বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠলো গরিলা।

'শুয়ে পড়ো! জলদি!' শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে সরে গেল চারজনেই।

ফটাস করে একটা শব্দ হলো।

মুখ ফিরিয়ে ছেলেরা দেখলো, কলিনস আর ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন গরিলাটার পেছনে। ডাক্তারের হাতে উদ্যত স্টান গান।

দুলে উঠলো গরিলাটা। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোলো গলা থেকে। গুঙিয়ে উঠে ধুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

উঠে দাঁড়ালো ছেলেরা। হাঁটু কাঁপছে। বুকের খাঁচায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ড।

'এই, ঠিক আছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন কলিনস।

কম্পিত কণ্ঠে জানালো ছেলেরা, ঠিক আছে।

পড়ে থাকা গরিলাটাকে দেখছেন ডাক্তার। আপনমনে বিড়বিড় করলেন, 'অনেকক্ষণ ঘুমাবে। বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো।'

'ভাগ্যিস সময়মতো এসেছিলাম,' বললেন কলিনস। 'ব্যাটা ফালতু কথা বলে খাদের দিকে পাঠালো আমাদের।'

'কে?' এগিয়ে এলো কিশোর।

'আর কে? ফ্র্যাঙ্কলিন সিন।'

ঝুঁকে গরিলার দুই হাত তুলে ধরেছেন ডাক্তার। 'এই উইলবার, পা দুটো ধরো। গাড়িতে তুলি।'

'দাঁড়াও, আগে বেঁধে নিই,' কলিনস বললেন। 'বলা যায় না, কখন হুঁশ ফিরে আসে।'

গরিলাটার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা হলো। বেজায় ভারি। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো গাড়ির কাছে। দু'জন মানুষের জন্যে কাজটা কঠিন হতো, ছেলেরা সাহায্য না করলে। যা হোক, অবশেষে জীপের পেছনে তোলা হলো ওটাকে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এখন?' কলিনসকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'খাঁচায় ভরবো আবার।'

'কাকু,' ডিক বললো, খাঁচার একটা শিক খোলা। দুটো বাঁকানো। কিশোর বলছে,

একটা শিক খুলে নিয়েছে কেউ। সুযোগ পেয়ে বাকি দুটো শিক বাঁকিয়ে বেরিয়ে গেছে গরিলাটা।'

নীরবে কিশোরের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন কলিনস। মাথা দোলালেন। 'ঠিকই বলেছে। তারমানে কেউ স্যাবোটাজ করতে চাইছে আমাদের।'

'দেখেশুনে তো তা-ই মনে হচ্ছে, স্যার,' কিশোর বললো। 'কিন্তু ওই ভাঙা খাঁচায় আবার রাখবেন গরিলাটাকে? থাকবে?'

'ভাঙা খাঁচা নয়। ইতিমধ্যে নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। লোক লাগিয়ে দিয়ে এসেছি।'

চলতে শুরু করলো জীপ।

ওটার পেছনে প্রায় দৌড়ে চললো ছেলেরা।

বাড়িতে পৌঁছে দেখলো, খাঁচার কাছে একজন বিশালদেহী লোক। খাটো করে ছাঁটা চুল। পেশীবহুল শরীর। এক হাতে উল্কি দিয়ে আঁকিবুকি আঁকা। বড় একটা হাতুড়ি নিয়ে কাজ করছে।'

'হয়ে গেছে,' কলিনসকে বললো লোকটা। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললো, 'ধরে ফেলেছেন? তাড়াতাড়িই পেরেছেন।'

খাঁচার কাছে এগিয়ে গেলেন কলিনস। সড়ে দাঁড়ালো লোকটা।

নতুন লাগানো শিকগুলো শক্ত করে ধরে টেনে, ঝাঁকি দিয়ে দেখলেন কলিনস। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। থ্যাংকিউ, ব্রড। এসো, একটু সাহায্য করো আমাদেরকে। কিংকঙের বাচ্চা সাংঘাতিক ভারি।'

'নিশ্চয়,' হাত থেকে হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে জীপের দিকে এগোলো ব্রড।

'রাখো,' হাত তুললেন ডাক্তার, 'আমি একবার দেখি খাঁচাটা। আজকের দিনটা যা গেল না। জানোয়ার খুঁজতে খুঁজতে জান খারাপ। আরেকবার ছুটলে আর খুঁজতে পারবো না।'

হেসে বললো ব্রড, 'তা ঠিক, খুব খেটেছেন আজ। দেখুন, আপনিই দেখুন, ভালোমতো লাগানো হয়েছে কিনা।'

পড়ে থাকা হাতুড়িটা তুলে নিয়ে খাঁচার কাছে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। প্রতিটি শিকে বাড়ি দিয়ে দেখতে শুরু করলেন। একটা করে বাড়ি দেন, আর কান পেতে শোনেন আওয়াজ কেমন বেরোচ্ছে। কোনো শিকে চিড়চিড় কিছু আছে কিনা, কিংবা ফাঁপা কিনা, তা-ই যেন বোঝার চেষ্টা করছেন। চিড় থাকলে শিকের জোর কম হবে, বাঁকিয়ে ফেলতে পারে গরিলা। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছেন।

'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো ব্রড।

'মনে তো হচ্ছে।' কড়া চোখে ব্রডের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'ভালোমতো

কাজ করবে, এটাই আশা করি। টোল কিনের মতো করলে থাকতে পারবে না, বলে দিলাম।'

'পারবে পারবে,' হাত নাড়লেন কলিনস। 'তোমার লোক তো। তুমি যখন দিয়েছো, কাজের লোকই হবে। খামোকা বেচারাকে ধমকাচ্ছো।'

'হুঁশিয়ার করে দিলাম আরকি, ফাঁকিবাজি যাতে না করে। আর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট চাই না এখানে।' গরিলার খাঁচাটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থেকে বললেন, 'কে শিকটা খুলে নিলো কিছুই বুঝতে পারছি না! গরিলায় খুললে তো এখানেই পড়ে থাকতো।' বলতে বলতেই চিতার খাঁচাটার দিকে চোখ পড়লো। 'দেখি, ওটাও একবার দেখে আসি। ছুটে না যায় আবার।'

হাতুড়ি হাতে চিতার খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। লাফ দিয়ে উঠে খাঁচার দেয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়লো চিতাটা। চাপা গলায় গর্জাচ্ছে।'

মোলায়েম গলায় ওটার সংগে কথা বলতে বলতে শিকগুলোয় বাড়ি দিতে লাগলেন ডাক্তার।

'খুঁজছেনটা কি?' মুসার প্রশ্ন।

'বোধহয় মেটাল ফ্যাটিগ।' বুঝিয়ে দিলো কিশোর, 'কিংবা বলতে পারো ধাতুর অবসাদ! তাতে ধাতুর জোর কমে যায়। এয়ারপোর্টে প্লেন ওড়ার আগে ওরকম পরীক্ষা করা হয়।'

'কিন্তু এভাবে হাতুড়ি দিয়ে?' রবিন বললো। 'ওরা করে অন্যভাবে।'

'এটা হয়তো ডাক্তারের নিজস্ব পদ্ধতি। তাঁর কাজ, তিনি ভালো বোঝেন। জন্তুজানোয়ার নিয়ে কারবার, খাঁচা বিশেষজ্ঞ তিনি হবেন না তো আর কে হবে?'

ফিরে এলেন ডাক্তার। সন্তুষ্টই মনে হলো তাঁকে। 'ঠিকই আছে মনে হয়। গরিলাটাকে ঢোকানো যায়।'

গরিলাটাকে খাঁচায় ভরা হলো। হুঁশ ফেরেনি। বাঁধন খুলে দিলেন কলিনস। বেরিয়ে এসে খাঁচার দরজা আটকে দিলেন।

'আমি যাই,' জীপের দিকে এগোলেন ডাক্তার। উঠে বসে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'একটা ঘোড়ার কি জানি হয়েছে। এখনই গিয়ে ওকে দেখতে হবে। উঁহুঁবার, কোনো দরকার হলে ডেকো আমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার। আজ রাতে আর ডাকতে না হলেই বাঁচি।'

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে জীপ নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো দিলো রবিন। 'মজা আসছে,' ফিসফিসিয়ে বললো, 'জনাব ফ্র্যাঙ্কলিন সিন।'

কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে থেমে দাঁড়ালো স্টেশন ওয়াগন। লাফ দিয়ে নামলো

টাকমাথা পরিচালক। গরিলার খাঁচার দিকে একবার চেয়েই কথার তুবড়ি ছোটালো, 'পেয়েছেন, তাহলে, অ্যাঁ? পেলেন তো, কিন্তু অনেক দেরি করে। আরও অনেক আগেই ধরতে পারা উচিত ছিলো। ওদিকে আমার লোকেরা তো ভয়ে বাঁচে না।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' ধীরে বললেন কলিনস। 'আরও আগেই ধরতে পারতাম, ফালতু কথা বলা না হলে। এদিকেই ছিলো ওটা, বেড়ার কাছাকাছি। আপনি বললেন খাদের দিকে গেছে। সেদিকে গিয়েই তো দেরিটা করলাম।'

'ওদিকে ডাকতে শুনেছি, তাই বললাম, দোষটা কি হলো শুনি?' গলা চড়িয়ে বললেন, 'দেখুন মিস্টার, এরকম হতে থাকলে শূটিং করবো কিভাবে? তালা দিয়ে রাখেন না কেন আপনার হারামী জানোয়ারগুলোকে? আমার লোক ভাগাবেন দেখছি।'

'সরি, মিস্টার সিন,' তাড়াতাড়ি বললেন কলিনস, 'এগুলো ছোটখাটো দুর্ঘটনা। সিরিয়াস কিছু হয়নি। যা হয়েছে হয়েছে, এখন সব ঠিক আছে। নিশ্চিন্তে গিয়ে কাজ করতে পারেন। আসলে, আপনাদের জন্যেই হচ্ছে এরকম, এটা না বলে পারছি না। হৈ-চৈ বেশি করছেন, তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে আমার জানোয়ারগুলো।'

রাগে লাল হয়ে গেল সিনের মুখ। 'শূটিং করবো, হৈ-চৈ তো হবেই। মুখে তালা এঁটে শূটিং হয় নাকি? শুনেছেন কখনও···'

কানফাটানো তীক্ষ্ণ গর্জনে চমকে উঠে থেমে গেল সিন। পাঁই করে ফিরলো। খাঁচার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালো চিতাটা, দাপাদাপি করছে বেরোনোর চেষ্টায়।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল পরিচালকের চেহারা। দেখে মনে হলো, চোখ উল্টে বুঝি পড়ে যাবে এখুনি। এই প্রথম যেন চোখ পড়লো তিন গোয়েন্দার ওপর। ওদের হাসি হাসি মুখ দেখে জ্বলে উঠলো রাগে, 'এরা কারা? এখানে কি করছে?'

'ওরা আমার মেহমান,' বললেন কলিনস। 'আমাকে সাহায্য করতে এসেছে। তো, আপনার আর কিছু বলার আছে?'

চিতাটার মতোই জ্বলে উঠলো পরিচালকের চোখ। দ্রুত উঠছে নামছে বুক। 'আপনার জানোয়ার সামলে রাখবেন, ব্যস। নইলে পস্তাবেন বলে দিলাম।'

ঘুরে, গটমট করে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলো সে। চলে গেল।

অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'লোকটার ব্যবহার কিন্তু মোটেই চিত্রপরিচালকের মতো নয়। বেশি বদমেজাজী, অস্থির।'

'আছে ওরকম লোক,' মুসা বললো। 'সিনেমা লাইনে ওদেরকে বলে "কুইকি"। টাকা কম। তাই যতো কম টাকায় কম সময়ে পারে, ছবি নামিয়ে খালাস। মেজাজ তাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে সারাক্ষণ। আমার ধারণা, টাকার সমস্যা আছে লোকটার।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো,' বললো কিশোর, 'শব্দটা কিন্তু নেই আর এখন। মেটাল শ্রেডার। অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ। চলো, বেড়ার কাছে। আরেকবার দেখতে চাই।'

'আমি যেতে পারছি না, কিশোর,' ডিক বললো, 'সরি। এখানে কাজ আছে। চাচাকে সাহায্য করতে হবে। তোমরা যাও।'

ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'বেশিক্ষণ থাকবো না। আরেকবার দেখেই চলে যাবো। কাল আসবো আবার, ভালো করে দেখার জন্যে।'

রওনা হলো কিশোর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিছু পিছু চললো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'আবার কি কানের পর্দার জোর পরীক্ষা করতে যাচ্ছি নাকি?' অন্ধকার বুনোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'এবার যে কোন্ জানোয়ারে তাড়া করবে, আল্লাহই মালুম,' মুসা বললো।

জবাব দিলো না কিশোর। নীরবে এগিয়ে চলেছে। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে একটা গাছের গোড়ায় এসে বসলো।

'কি···,' বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

'চুপ।' চাপা গলায় সাবধান করলো কিশোর।

নীরবে কিশোরের পাশে বসে পড়লো দুই সহকারী।

মেটাল শ্রেডার এখন নীরব।

'দেখো,' স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে দেখালো কিশোর, 'ওই যে লোকটা। চেনা চেনা লাগছে না?'

বেড়ার ওপাশে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় আলোকিত ইয়ার্ডের চত্বর। একটা লোক। সিগারেট ধরানোর জন্যে এক সময় দিয়াশলাই জ্বাললো লোকটা। কিছুক্ষণের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল তার চেহারা।

'আরি, কোদালমুখো!' চেঁচাতে গিয়েও সামলে নিলো মুসা, কণ্ঠস্বর খাদে নামালো। 'আজ সকালে ওই ব্যাটাই তো খাঁচা কিনতে গিয়েছিলো।'

'ঠিকই চিনেছো,' রবিন বললো, 'নাম যেন কি বলেছিলো?' ডেইমিং। ও-ব্যাটা ওখানে কি করছে?'

'এই, শোনো,' দু'জনকে চুপ করিয়ে দিলো কিশোর।

কটকট, খড়খড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

চকচকে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে কোদালমুখোর হাতে, পকেট থেকে বের করছে। মুখের কাছে নিয়ে গেল সেটা।

আবার খড়খড় করে উঠলো তার হাতের জিনিসটা।

'ওয়াকি-টকি,' বললো কিশোর। 'ট্রান্সমিট করছে কোদালমুখো।'

'চলো, যাই,' আবার বললো কিশোর। 'কি বলে, শুনি।'

বেড়ার কাছে এক জায়গায় একগুচ্ছ ইউক্যালিপটাস গাছ জন্মে আছে। ওগুলোর ঝুলে ছড়িয়ে থাকা ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে বসা যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোতে শুরু করলো কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা। ছায়ায় ছায়ায় নীরবে চলে এলো গুচ্ছটার তলায়। বাতাসে এক ধরনের তৈলাক্ত ওষুধী গন্ধ ছড়াচ্ছে ইউক্যালিপটাস। ডেইমিঙের কাছ থেকে বড় জোর বিশ ফুট দূরে রয়েছে এখন ওরা।

যান্ত্রিক শব্দ বেরোলো ওয়াকি-টকির স্পীকার থেকে।

ওটা প্রায় ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে কথা বললো ডেইমিং।

শোনা গেল। বুঝতে পারলো ছেলেরা।

'এদিকে এসো,' বললো ডেইমিং।

'আসছি,' জবাব দিলো স্পীকার।

জঞ্জালের পাহাড়ের ধার দিয়ে চুপি চুপি আসতে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। ওই লোকটার হাতেও ওয়াকি-টকি। লম্বা অ্যান্টেনা পুরো খুলে রেখেছে।

'কিছু পেলে, ডারেল?' জিজ্ঞেস করলো কোদালমুখো।

'না,' জবাব এলো ওয়াকি-টকিতে।

'দেখো ওখানে। কোনো কিছুর তলায় লুকিয়েছে হয়তো। আমি এখানটায় দেখছি।'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা ভাঙা মাডগার্ড তুলে ছুঁড়ে ফেললো কোদালমুখো। নীরবতার মাঝে ঝনঝন শব্দটা বেশি জোরালো হয়ে কানে বাজলো। একটা বাম্পার, একটা রেডিয়েটর গ্রিল সরালো ডেইমিং। ভালোমতো খুঁজে দেখলো। মাথা নাড়লো।

এগিয়ে আসছে অন্য লোকটা। ডেইমিঙের মতোই জঞ্জাল সরিয়ে দেখতে দেখতে আসছে। একেবারে কাছে চলে এলো লোকটা। ডেইমিঙের মতোই সে-ও একটা কালো বিজনেস সুট পরেছে।

দু'জনেই চেপে নামিয়ে দিলো যার যার ওয়াকি-টকির অ্যান্টেনা।

'খড়ের গাদায় সুই খুঁজছি আমরা,' বললো দ্বিতীয় লোকটা।

'জানি,' কোদালমুখোর জবাব। 'কিন্তু হারানো চলবে না। খুঁজে বের করতেই হবে।'

'অন্যটাতে গিয়ে খুঁজলে কেমন হয়?'

'ওই জাহাইয়ার্ডটা? মনে হয় না আছে ওখানে। তবে কোঁকড়াচুলো ছেলেটার ওপর

চোখ রাখা দরকার। দেখে যেরকম মনে হয়, ততো বোকা নয় ছেলেটা। বোধহয় কোনো কিছুর গন্ধ পেয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা। 'কৌকড়াচুলো' বলতে কাকে বুঝিয়েছে, বুঝতে পেরেছে।

ক্ষণিকের জন্যে এদিকে ফিরলো দ্বিতীয় লোকটা। চাঁদের আলোয় তার চেহারা দেখা গেল। ছোট কুতকুতে চোখ, থ্যাবড়া নাক—যেন থাবড়া মেরে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। 'কলিনস যে দুটো আনলো আজকে, ওগুলোতে আছে? খুঁজবো?'

মাথা নাড়লো ডেইমিং। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলো। 'না, এখন না। টের পেলে পাখি উড়ে যেতে পারে।' কাগজটা দেখিয়ে বললো, 'ডোরাস লামের মেসেজঃ ডব্ল রক্স নক্স এক্স রেক্স বক্স। ছ'টা এক্স । কেব্‌ল্ কোড। হয়তো ছ'শো 'কে'-এর কথা বলছে। তার মানে দশ লাখ ডলার। বুঝলে ডারেল, সোজা ব্যাপার না। অনেকগুলো পাথর।'

কাঁধ ঝাঁকালো ডারেল। 'তা-তো বুঝলাম। কিন্তু দেরি করলে না সাফ করে ফেলে। এখুনি গিয়ে ধরছি না কেন ব্যাটাকে?'

কাগজের টুকরোটা পকেটে রাখতে রাখতে বললো ডেইমিং, 'অপেক্ষা করতেই হবে। সুযোগ নিশ্চয় দেবে। হুঁশিয়ার আর কতোক্ষণ থাকবে? খালি একটা ভুল করুক, অমনি ক্যাঁক করে ধরবো। আর তার আগেই যদি পাথরগুলো পেয়ে যাই, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। একই সংগে দুই পাখি।'

'ঠিক আছে। যা ভালো বোঝো।'

'সিন ব্যাটা এসবে আছে কিনা, বোঝা দরকার। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পঞ্চাশ হাজারের চুক্তি করেছে। শর্তের গোলমাল হলে কেস ঠুকে দেবে কলিনসের নামে, টাকাটা না দেয়ার চেষ্টা করবে। গরিলাটাকে সে-ও ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারে।'

হেসে উরুতে চাপড় মারলো ডারেল। 'ব্যাটাকে বাগে পেলে দেখে নেবো এক হাত। সেদিন শূটিং দেখতে গিয়েছিলাম, সেটা থেকে বের করে দিলো আমাকে।'

কোদালমুখোও হাসলো। 'আমার সংগে অবশ্য এখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। যাকগে, চলো আজ যাই। কাল আবার এই সময়ে এসে খুঁজবো।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো ডেইমিং।

ডারেল চললো তার উল্টোদিকে।

কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ইঙ্গিত করলো মুসা, ডেইমিং যেদিকে যাচ্ছে, দেখালো। এক জায়গায় জালের বেড়া কাত হয়ে মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। অথচ, আগের বার ওটা খাড়া দেখেছিলো ওরা।

কাত হয়ে থাকা বেড়া পেরিয়ে এপারে চলে এলো ডেইমিং। খুটিটাকে তুলে আবার সোজা করে দিলো বেড়াটা। হাতের ধুলো ঝাড়লো। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো, সাদা বাড়িটার দিকে চলেছে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

উঠলো তিন গোয়েন্দা। স্যালভিজ ইয়ার্ডটা নীরব। কাজ বন্ধ। ডারেলকেও দেখা যাচ্ছে না আর। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো ছেলেরা।

কিসের শব্দে চমকে থেমে দাঁড়ালো মুসা। অন্য দু'জনও দাঁড়িয়ে গেল।

ঘাসের মধ্যে কিসের নড়াচড়া। হালকা পদশব্দ।

আবার কোন জানোয়ার! কালো চিতাটা না-তো? দুরুদুরু করে উঠলো ছেলেদের বুক।

ঘাসবনের কিনারে একটা গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি।

কি, দেখার জন্যে দাঁড়ালো না ছেলেরা। ঘুরেই দিলো দৌড়।

শেকড়ে হোঁচট খেয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো কিশোর। হাত-পা ছুঁড়ে পাগলের মতো ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হাতে লাগলো ঠাণ্ডা, শক্ত কিছু। আত্মরক্ষার তাগিদে ধরলো জিনিসটা, তুলে নিলো, বাড়ি দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা অন্তত করা যাবে। উঠে দাঁড়ালো। পেছনে শোনা গেল গোঁ গোঁ। হাতের জিনিসটা এক নজর দেখলো সে, একটা লোহার শিক।

কিশোরের হাত ধরলো মুসা। টেনে নিয়ে চললো।

পেছনে অন্ধকারে রাগে চেঁচালো কেউ। টর্চ জ্বলে উঠলো। আলো এসে পড়লো ছেলেদের গায়ে।

ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটে আসছে ভারি লোকটা।

দেখার জন্যে থামলো না ছেলেরা, ছুটছে। রবিন আগে আগে। পেছনে অন্য দুজন, কিশোরকে প্রায় হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে মুসা। হাতের শিকটা ফেলেনি গোয়েন্দাপ্রধান।

পেছনে চিৎকার করছে লোকটা, ওদেরকে থামতে বলছে।

থামলো তো না-ই, বরং গতি আরও বাড়ালো ওরা।

পেরিয়ে এলো পাহাড়। এতো জোরে হাঁপাচ্ছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। বন থেকে বেরিয়ে পথে এসে পড়লো—এই পথই গেছে কলিনসদের বাড়িতে। রোলস রয়েসটা দেখতে পেলো, আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ছুটলো সেদিকে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লো কিশোর। 'হ্যানসন! জলদি ছাড়ুন!'

তিন গোয়েন্দার কাজের সংগে পরিচিত হ্যানসন। একটা প্রশ্নও না করে এঞ্জিন

স্টার্ট দিলো। মুসা আর রবিন উঠে বসতেই চলতে শুরু করলো গাড়ি। রওনা দিলো গেটের দিকে।

বনের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে এসে পথে নামলো বিশালদেহী এক লোক। ব্রড। টর্চ নাচিয়ে, হাত নেড়ে চেঁচামেচি করছে, থামতে বলছে ওদেরকে।

'থামবেন না,' বললো কিশোর। 'চালিয়ে যান।'

গায়ের ওপরই এসে পড়ে দেখে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ব্রড। পিছে চেয়ে দেখলো ছেলেরা, আফ্রিকান জংলী নৃত্য জুড়েছে জাঙ্গল ল্যাণ্ডের নতুন সহকারী, ঘুসি পাকিয়ে দেখাচ্ছে। তাকে দোষ দিতে পারলো না ওরা। হয়তো তার ওপর নির্দেশ রয়েছে কড়া পাহাড়া দেয়ার জন্যে। তার কাজ সে করছে।

গেটের পাল্লা বন্ধ। দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গেল মুসা। তালাবন্ধ নয়, শুধু ভেজিয়ে রাখা হয়েছে। ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা খুলে দিয়েই আবার দৌড়ে এসে উঠলো গাড়িতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা। 'ব্রড আমাদের চেনে। ও এমন ব্যবহার করলো কেন, কিশোর?'

গোয়েন্দাপ্রধান শুনলো বলে মনে হলো না। একনাগাড়ে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

নিরাপদেই ইয়ার্ডে পৌঁছলো রোলস রয়েস। ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।

অনেক রাত হয়েছে। তবু একবার হেডকোয়ার্টারে ঢুকে খানিকক্ষণ আলোচনা করাটা উচিত মনে করলো কিশোর। হাতের শিকটা ওয়ার্কশপের ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরালো সে।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই আবার প্রশ্ন করলো মুসা, 'ব্রড ওরকম করলো কেন?'

'তাতে আমি কোনো রহস্য দেখছি না,' জবাব দিলো কিশোর।

'তার ওপর পাহারার ভার রয়েছে। সন্দেহজনকভাবে আমাদেরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাড়া করেছে। ব্যস।'

'তারমানে আমরা থামলেই চুকে যেতো?'

'হয়তো।'

'তাহলে থামলাম না কেন?'

'সব সময় কি আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যায়?'

'যতো যা-ই বলো, ওর ব্যবহার পছন্দ হয়নি আমার।'

'আমারও না,' মুসার সংগে একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু কি করা যাবে বলো?

সব মানুষের ব্যবহার তো একরকম হয় না। যাকগে ওর কথা। কোদালমুখো আর থ্যাবড়া নাকের কথায় আসা যাক…'

'প্রথমেই ধরা যাক,' কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বললো রবিন, 'ইয়ার্ডে কি খুঁজছিলো ওরা?'

'ছোট কিছু,' বললো মুসা। 'বললো না, খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছে?'

'ছোটই হবে এমন কোনো কথা নেই,' কিশোর বললো। 'ওরকম একটা জাঙ্কইয়ার্ডে বড় জিনিস লুকিয়ে রাখলেও সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কি লুকিয়েছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'তবে, ওদের কথা থেকে কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। রবিন, কাগজটা দেখিয়ে কোদালমুখো কি কি বলেছিলো, মনে আছে?'

'আছে,' বলেই গড়গড় করে আউড়ে গেল রবিন, ডোরাস লামের মেসেজঃ ডক্স রক্স নক্স এক্স রেক্স বক্স। ছ'টা এক্স। এটা কেব্‌ল্ কোড। হয়তো ছ'শো 'কে' এর কথা বলেছে। তার মানে দশ লাখ ডলার। বুঝলে ডারেল, সোজা ব্যাপার না। অনেকগুলো পাথর।'

'ভেরি গুড। নোটবইয়ে লিখে ফেলো। পরে ভুলে যেতে পারো।' থামলো কিশোর। রবিনকে লেখার সময় দিলো। তারপর বললো, 'বেশ, এবার কথাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ডোরাস লাম্ কে, জানি না আমরা। এটুকু বুঝতে পারছি, কেব্‌ল্ করেছে সে, তারমানে কোথাও থেকে মেসেজ পাঠিয়েছে। আর মেসেজটা পাঠিয়েছে কোডের মাধ্যমে, সাংকেতিক শব্দে।'

'মানে কি শব্দগুলোর?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'উচ্চারণের তারতম্যে অনেক সময় শব্দের মানে অন্যরকম হয়ে যায়। ডেইমিং উচ্চারণ করেছে ইংরেজি 'এক্স'-এর মতো করে। বলেছেও বটে এক্স। কিন্তু তার বোঝার ভুল যদি হয়ে থাকে?—যদিও সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু শব্দগুলো এমনও তো হতে পারেঃ ডক্স্ রক্স্ নক্স্ এক্স রেক্স্ বক্স। অর্থাৎ, এক্স আর বক্স বাদে বাকিগুলোতে শেষ অক্ষর এক্স-এর পরিবর্তে সি কে এস?' একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখলো সে। বাড়িয়ে দিলো সঙ্গীদের দিকে, 'এরকম?'

দেখলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিশোর লিখেছেঃ DOCKS ROCKS KNOCKS EX WRECKS BOXES।

'তা নাহয় হলো,' মাথা নাড়লো মুসা। 'কিন্তু এসবেরই বা মানে কি?'

'ঠিক বলতে পারবো না, তবে অনুমান বোধহয় করতে পারছি।' উত্তেজনা ফুটলো কিশোরের কণ্ঠে, 'এই যেমন ধরো, রক্স্। দশ লাখ ডলারের কথাও বলেছে ডেইমিং। বলেছে, অনেকগুলো পাথর। কিছু বুঝতে পারছো?'

'দশ লাখ ডলার দামের পাথর? কার এতো মাথা খারাপ হয়েছে? এতো টাকা দিয়ে পাথর কিনবে?'

'পাথর অনেক ধরনের হয়, মুসা আমান,' রহস্যময় কণ্ঠে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'রক্‌সের আরও একটা প্রতিশব্দ আছে, অবশ্য স্ল্যাঙ। টাকাকেও রক্‌স্ বলা হয়। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, টাকার গন্ধ পেয়েছে ডেইমিং আর ডারেল। দশ লাখ ডলার। কোনো ষড়যন্ত্র করছে। ওদের কথাবার্তা চালচলনে ডাকাত বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

'ওটা তোমার অনুমান,' রবিন মেনে নিতে পারছে না। 'ধরলাম, তোমার কথাই ঠিক। মেসেজের বাকি কোডগুলোর মানে কি?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। 'এখনও জানি না। হয়তো, বলা হয়েছে, টাকাগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। সংকেতের মানে বের করতে পারলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের কাছে। হতে পারে, টাকাগুলো লুটের মাল, ডাকাতি করে এনেছে।'

'পাথরগুলো পাওয়া গেলে একসংগেই দুই পাখি ধরার কথা বললো,' মনে করিয়ে দিলো মুসা। 'কাদের কথা, কিসের কথা বোঝালো?'

আবার মাথা নাড়লো কিশোর। 'জানি না। তবে কোনো একজনের কথা বুঝিয়েছে। যে হুঁশিয়ার থাকে, এবং যে কোনো মুহূর্তে ভুল করে বসতে পারে।'

'সেই লোকটা কে?'

'হয়তো ফ্র্যাঙ্কলিন সিন,' বললো রবিন।

'সে কেন এসব করতে যাবে, বুঝতে পারছি না আমি,' গাল চুলকালো কিশোর। 'গরিলা ছাড়ার ব্যাপারে যদি কারো হাত থাকে, তাহলে সেটা টোল কিন। অন্তত স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু তার সংগে পাথর আর দশ লাখ ডলারের কি সম্পর্ক?'

আঙুল দিয়ে টেবিলে টাটু বাজালো কিশোর। চুপ করে ভাবলো কিছুক্ষণ। বললো, 'আসলে, সঠিক পথে ভাবছি না আমরা, ফলে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রথম কথাটাই ভুলে যাচ্ছি আমরা, আজ সকালে খাঁচা কিনতে এখানে এসেছিলো ডেইমিং। তারপর, খানিক আগে তার সঙ্গীর কাছে কথাটার উল্লেখও করেছে।'

'ও হয়তো ভাবছে খাঁচার মধ্যে রয়েছে পাথরগুলো,' রসিকতার ভঙ্গিতে বললো মুসা।

'হেসো না,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'মেসেজে বক্স বলা হয়েছে, তারমানে খাঁচাও হতে পারে। "রেক্‌স বক্স" মানে ভাঙা খাঁচা না বুঝিয়ে হয়তো বুঝিয়েছে, খাঁচাগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করো, পাথর পেয়ে যাবে। কিংবা টাকা।'

'তোমাদের এখানকার চারটে খাঁচা টুকরো টুকরোই হয়ে আছে,' বললো মুসা। 'আর ডেইমিঙের কাছেও ওগুলো তেমন দামী মনে হয়নি। তাহলে বিশ ডলার দেধেই

বিদেয় হতো না।'

'তা ঠিক।'

'সারাদিনের উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে মাথা গরম হয়ে আছে আমাদের।' মুসা প্রস্তাব দিলো, 'এখন আর ভাবাভাবি না করে চলো গিয়ে ঘুমাই। সকালে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে'খন।'

'ঠিকই বলেছো। তবে…' থেমে গেল কিশোর।

'তবে?'

'জটিল একটা রহস্য দানা বেঁধেছে,' সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো কিশোরের মুখে। 'সমাধান করে আনন্দ পাবো।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো আবার তিন গোয়েন্দা।

'জাঙ্গল ল্যাণ্ডে যাবো আজও,' ঘোষণা করলো কিশোর। 'তার আগে কিছু কথা আছে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। আমার অনুমান ঠিক হলে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটবে আজ ওখানে।'

আগ্রহে সামনে ঝুঁকলো দুই সহকারী।

'কি ঘটবে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

মুসার চোখেও একই প্রশ্ন।

বজ্রপাত ঘটালো যেন কিশোর, 'কলিনস ভাইয়েরা চোরাচালানীদের দলের সং জড়িত।'

'কী!' চমকে গেল দুই সহকারী।

'সিলভার কলিনস তার ভাইয়ের কাছে এখানে জানোয়ার পাঠায়,' বলে চল-া কিশোর। 'ওটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার। তলে তলে চলছে হীরা চোরাচালান।'

'হীরা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।

'হ্যাঁ, হীরা। হীরাও একধরনের পাথর, তাই না? 'জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলে চললো কিশোর, 'ডিক আমাদের জানিয়েছে, তার চাচা রুয়ানডায় গেছে গরিলা জোগাড়ের জন্যে। শুধু রুয়ানডাই নয়, আরও অনেক জায়গায় গেছে। জন্তুজানোয়ার জোগাড়ের ছুতোয় চষে বেড়িয়েছে সমস্ত আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক জায়গায় হীরার খনি পাওয়া গেছে, আগেও ছিলো, এখনও আছে। কঙ্গো, ঘানা, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, দা রিপাবলিক অভ সেন্ট্রাল আফ্রিকা…এসব অঞ্চল থেকে

হীরা রপ্তানী হয়।'

একটা ম্যাপ বের করলো কিশোর। 'এই যে, পূর্ব আফ্রিকা, রুয়ানডা থেকে বেশি দূরে নয়। এই যে দেখো, উগাণ্ডা আর কেনিয়া কাছাকাছিই। ওখানে হীরার খনি আছে। জন্তুজানোয়ারও আছে প্রচুর। সিলভার কলিনস জানোয়ার পাঠানোর জন্যে যদি পূর্ব উপকূলে যায়, স্বাভাবিকভাবেই যেতে হয় এইসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে। উপকূলে ওখানে বেশ বড় একটা বন্দর-শহর আছে। নাম দারেস সালাম।'

শিস দিয়ে উঠলো মুসা। 'কানে পরিচিত লাগছে।'

দ্রুত পকেট থেকে নোটবুক বের করলো রবিন। পাতা উল্টে এসে থামলো এক জায়গায়। 'গতরাতে ডেইমিং বলেছিলো ডোবাস লাম! তারমানে দারেস সালামকেই উচ্চারণের কারণে ওরকম শোনা গেছে?'

'তা-ই,' মাথা ঝোকালো কিশোর। 'ওই মেসেজ কি করে জোগাড় করলো ডেইমিং, বুঝতে পারছি না। আমার যা মনে হয়, সিলভার তার ভাইকে পাঠিয়েছে ওই মেসেজ। জানোয়ার শিপমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর। বলেছে, যে হীরাগুলো আসছে।' জ্বলজ্বল করছে গোয়েন্দাপ্রধানের চোখ। "মেসেজের প্রথম শব্দটা হলো ডক্স—ডি ও সি কে এস, অর্থাৎ জেটি। তারমানে বন্দর থেকে জাহাজে পাঠানো হয় হীরা।

'এরপর হলো রকস্, মানে, পাথর; মানে হীরা।

'তৃতীয় আর চতুর্থ শব্দটার মানে এখনও বুঝতে পারিনি। তবে রেকস বক্স-এর মানে বুঝেছি। আসলে ওটা আর ই এক্স, রেক্সই হবে। এবং তাহলেই খাপে খাপে মেলে।' থামলো সে।

'থামলে কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে বললো মুসা। 'বলো।'

'রেক্স ইংরেজী নয়, ল্যাটিন। মানে হলো, রাজা। সিংহকে আমরা বলি পশুর রাজা। তাহলে? রেক্স বক্স বলে বোঝাতে চেয়েছে সিংহের খাঁচা, অর্থাৎ ভিকটরের খাঁচা। ভিকটরকে আনা হয়েছে আফ্রিকা থেকে, আর তার খাঁচায় করেই হীরাগুলোও। এবং আমার ধারণা, তারপর কোনোভাবে হীরাগুলো নিখোঁজ হয়েছে। ওগুলোকেই বার বার খুজতে আসছে কেউ, নার্ভাস করে তুলছে ভিকটরকে।'

মাথা দুলিয়ে বললো মুসা, 'ঠিক বলেছো। সাধারণ কুকুরও রাতের বেলা অপরিচিত কাউকে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে দেখলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে।'

'কিন্তু উইলবার কলিনস ভিকটরের অপরিচিত নয়,' রবিন বললো।

'না, উইলবার কলিনস ভিকটরকে উত্তেজিত করেননি,' বললো কিশোর। 'অন্য কেউ।'

'ক্যাপ্টেন সিন?' মুসা বললো। 'সবাইকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা আছে ওর।'

হতে পারে। কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ মেলাতে পারছি না।'

তুড়ি বাজালো মুসা। 'বুঝেছি! টোল কিন। মনে আছে, সেদিন ডিকটরকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়েছে। সিংহটাকে বের করেছে খাঁচায় হীরা খোঁজার জন্যে।'

'ভুলে যাচ্ছো,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর, 'খাঁচা থেকে নয়, ঘর থেকে। ডিকটরের খাঁচা আগেই ফেলে দেয়া হয়েছে।'

'ডেইমিং আর ডারেলের ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করলো রবিন। 'ওরা কোথায় ফিট করছে? কি খুঁজছে, জানে ওরা। এমনকি কোথায় খুঁজতে হবে, মনে হলো তা-ও জানে।'

'হতে পারে, ওরা দু'জন একই দলের লোক। কলিনসদের দলের।'

'জাঙ্কইয়ার্ডে খুঁজতে গিয়েছিলো কেন তাহলে?'

'হীরাগুলো ওখানেও হারিয়ে থাকতে পারে। কি বলেছিলো ডারেল মনে আছে? খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছে।'

'দুই পাখির ব্যাপারটা কি তাহলে?'

'তাই তো! ওটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। নাহ্, এখানে এসে আবার মিলছে না। একদলের লোক না ওরা। এখন মনে হচ্ছে, ডেইমিং আর ডারেল কলিনসদের শত্রুও হতে পারে।'

'বড্ড গোলমেলে। জটিল।' গাল ফুলিয়ে ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো রবিন। 'ভাবছি, ডিক এসবের কতোখানি জানে!'

'বোধহয় কিছুই না। সাবধানে কথা বলতে হবে আমাদের। হাতে প্রমাণ না নিয়ে ওর চাচাদের বিরুদ্ধে ওর সামনে কিছুই বলা যাবে না। বুঝেছো?'

মাথা ঝাঁকালো রবিন আর মুসা।

'চলো এখন, বেরোই। আজও বোরিস যাবে ওদিকে। বলে রেখেছি, নিয়ে যাবে আমাদের। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

পনেরো

তিন গোয়েন্দার আসার অপেক্ষায় বাড়িতেই বসে ছিলো ডিক। সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলো।

শূটিং যেখানে হচ্ছে সেখানে নিয়ে চললো তিন গোয়েন্দাকে। সমতল খানিকটা খোলা জায়গা ঘিরে রেখেছে বড় বড় গাছপালা আর ঘন ঝোপ। ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একধারে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের চূড়া। চমৎকার সেটিং।

কাজ চলছে। সবাই ব্যস্ত। বেশি ব্যস্ত সিন। একবার গিয়ে অভিনেতাদের সংগে

তুমি। জন লড়াই করবে ওটার সংগে, গায়ের ওপর থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে, গড়াগড়ি করে সরে যাবে কয়েক ফুট। তারপর নিথর হয়ে পড়ে থাকবে, সিংহটা তার গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দাঁড়াবে।

'এরপর সিন কাট হয়ে যাবে। আর ছবি তোলার দরকার নেই। পরের দৃশ্যে চলে যাবো আমরা। ঠিক আছে? তোমাদের কাজ তোমরা ঠিকঠাক মতো করবে। এখন সিংহটা বেমক্কা কিছু করে না বসলেই বাঁচি।'

'দেখুন,' গম্ভীর হয়ে বললেন কলিনস, 'আপনার লোকদের ঠিকমতো চলার নির্দেশ দিন। ওরা বেমক্কা কিছু না করলে ভিকটরও করবে না। প্রাইস যদি চুপচাপ পড়ে থাকেন মাটিতে, ভিকটর আর কিছু করবে না। ওঠার চেষ্টা করলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। ওরকমই বোঝানো হয়েছে ওকে। আপনার অভিনেতারা উল্টোপাল্টা কিছু না করলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

পরিবেশ হালকা করার জন্যে প্রাইসের দিকে চেয়ে চোখ টিপলো পরিচালক। 'তোমার জীবন বীমা করানো আছে তো, জন?'

অভিনেতার মুখ শুকনো। 'রাখো তোমার রসিকতা। আমি এদিকে···' সরে গেল ওখান থেকে। সিগারেট ধরালো।

'ভয় পাচ্ছে বেচারা,' ফিসফিস করে বন্ধুদের বললো কিশোর। 'ভিকটরের ওপর সিনও ভরসা রাখতে পারছে না।'

শান্ত হয়ে বসে থাকা বিশাল জানোয়ারটার দিকে তাকালো মুসা। 'প্রাইসকে দোষ দেয়া যায় না। গায়ের ওপর জলজ্যান্ত এক সিংহ লাফিয়ে পড়বে ভাবতে কারই বা ভালো লাগে?'

'কিন্তু ভিকটর পোষা,' প্রতিবাদ জানালো ডিক। 'ও কখনো কারও কোনো ক্ষতি করেনি।'

'জন প্রাইসের না গতকাল কি জানি হয়েছিলো?' রবিন বললো। 'কই, আজ তো তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'মেক-আপ,' বললো মুসা।

অভিনেত্রীর দিকে এগিয়ে গেল সিন। 'জনের দৃশ্যটা নেয়ার পর পরই তোমার একটা দৃশ্য নেয়া হবে। দৃশ্যটা হবে এরকমঃ তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকবে তুমি। এককোণা ফাঁক করে মাথা গলিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকবে সিংহ। ওকে দেখে ভয় পেয়ে উঠে বসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবে তুমি। সিংহটাও তখন গর্জে উঠবে। ঠিক আছে? বোকার মতো কিছু করে বসো না। এই যেমন লাফ দিয়ে মাটিতে নামা, সিংহটাকে আঘাত করা···খবরদার, ওসব কিচ্ছু করবে না। শুধু বিছানায় উঠে বসবে, গা থেকে চাদর সরাবে, চিৎকার করবে, ব্যস। বুঝেছো?'

'সিংহের সংগে আর কখনও অভিনয় করিনি, মিস্টার সিন,' ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো অভিনেত্রী। 'সত্যি বলছেন, ও কিছু করবে না?'

হাসলো সিন। 'কলিনস গ্যারান্টি দিয়েছে, করবে না।'

কিন্তু অ্যানির মুখ দেখে মনে হলো না, খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

কিশোরের হাত ছুঁয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো মুসা। নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে কোদালমুখোকে দেখতে পেলো গোয়েন্দাপ্রধান, সেটের এক কিনারে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। ডিকের দিকে কাত হয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'ওই লোকটাকে চেনো? ওই যে, ও।'

'কোদালমুখোটা তো? চিনি। নাম জিনজার। সিনের সংগে কাজ করে।'

'জিনজার? তুমি শিওর? ডেইমিং না?'

'না না, জিনজার। আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ।'

দুই সহকারীর দিকে চট করে একবার তাকালো কিশোর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। মাথা ঝোঁকালো দু'জনেই।

'টোল কিনের কি খবর?' ডিককে জিজ্ঞেস করলো আবার কিশোর। 'আর দেখা গেছে ওকে?'

মুখ বাঁকালো ডিক। 'আরও? ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে জানে না?'

'আচ্ছা, ডিক, ভিকটরের খাঁচাটা কই? কোথায় ফেলেছো?'

'জানি না। যদ্দুর মনে হয়, ইয়ার্ডে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমাদের বেশিরভাগ জঞ্জালই ওখানে ফেলি। কেন?'

'এমনি। কৌতূহল।'

'ওকে, কলিনস,' হঠাৎ বলে উঠলো সিন, 'আপনার সিংহ নিয়ে ওখানে উঠুন গিয়ে।'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ভিকটরের কান ধরে টান দিলেন কলিনস। 'আয়, ভিকি। কাজ করতে হবে।'

বাধ্য ছেলের মতো কলিনসের সংগে সংগে চললো সিংহটা। এরপর তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলো।

পাহাড়ের নিচে অবস্থান নিলো প্রাইস আর অ্যানি।

ইশারা করলো সিন।

চেঁচিয়ে উঠলো সহকারী পরিচালক, 'রেডি ফর অ্যাকশন। সবাই চুপ।'

প্রায় সবগুলো চোখ একসাথে ঘুরে গেল অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিকে। পাহাড়ের ওপরে সিংহের মুখ দেখা যাবে। ঠিক ওই বিশেষ মুহূর্তে দুই সহকারীর হাত ধরে টানলো কিশোর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে এলো দু'জনে।

'কি ব্যাপার?' বিরক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'এটা একটা সময় হলো ডাকার? আসল সিনটা…'

'এই সুযোগটার অপেক্ষায়ই ছিলাম,' আস্তে বললো কিশোর। 'চলো, কাজ আছে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

গলায় রহস্য ঢেলে বললো কিশোর, 'হীরক অঞ্চলে।'

সাদা বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালো ছেলেরা।

'নতুন খাঁচাগুলো বোধহয় ওধারে,' বললো কিশোর। 'দেখবো। চোরাচালানের কাজে নিশ্চয় ওগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে। হুঁশিয়ার থাকবে।'

অবাক হলো রবিন। 'কেন? কার ভয়? সবাই তো এখন শূটিঙের ওখানে।'

'সবাই নয়,' আর কিছু বললো না কিশোর। বাড়ির পাশ ঘুরে অন্যধারে এগিয়ে গেল। তার কথামতো কোণের কাছে দাঁড়ালো মুসা আর রবিন। ভালো করে দেখলো, কাছেপিঠে কেউ আছে কিনা। নেই দেখে, কিশোর একটা জানালার নিচে এসে দাঁড়ালো। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো। ঘরেও কাউকে দেখা গেল না।

দুটো খাঁচা দু'দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একটার দিকে এগোলো ওরা। অন্যটা দেখা যায় না ওখান থেকে।

'কপাল ভালোই আমাদের,' ফিসফিস করে বললো রবিন। 'কিংকঙের বাচ্চা ঘুমোচ্ছে।'

খাঁচার এক কোণে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে গরিলাটা।

'চোরাই হীরা খোঁজার জন্যে ভেতরে ঢুকতে হবে নাকি?' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি।

জবাব না দিয়ে খাঁচার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'কিভাবে আনা হয়েছে? কোনো চোরা খোপটোপ…'

'হতে পারে,' বাধা দিয়ে বললো রবিন। 'কিন্তু সেটা বুঝবে কিভাবে?'

'নাহ্, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে ঢুকে দেখতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু গরিলাটা রয়েছে…,' ভাবনায় পড়ে গেল কিশোর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'আল্লাহ বাঁচিয়েছে। আমি তো ভাবছিলাম, গরিলাটার সংগেই ভেতরে ঢোকাবে আমাদেরকে।'

ঘুরে দাঁড়ালো কিশোর। 'চলো, চিতার খাঁচাটা দেখিগে।' কিছুদূর এগিয়েই স্থির হয়ে গেল হঠাৎ।

'কি হলো?' ভুরু নাচালো রবিন।

'চুপ! নড়বে না। দৌড় দেবে না।'

'হয়েছেটা কি?' ভয় পেয়েছে মুসা।

'সামনে দেখো,' কিশোরের গলা কাঁপছে। 'খাঁচার দরজা খোলা। চিতাটা ভেতরে নেই!'

শূন্য খাঁচার দিকে তাকালো দু'জনে। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। পা অবশ হয়ে আসছে, শরীরের ভার ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে যায় বুঝি। আতঙ্ক চরমে উঠলো, পেছন থেকে যখন শোনা গেল পরিচিত, ভয়াবহ শব্দটা। চিতার তীক্ষ্ণ শিস, সেই সংগে চাপা গর্জন।

ঢোক গিললো কিশোর। রবিন আর মুসার কাছ থেকে সামান্য তফাতে রয়েছে ও। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়লো ওটাকে। ফিসফিসিয়ে বললো, 'বিশ ফুট দূরে। ঠিক তোমাদের পেছনে। গাছের ওপর। একসাথে থাকা উচিত না আমাদের। আমি তিন গুণলেই···,' কথা শেষ হলো না। লম্বা ঘাসের মাথায় ঢেউ দেখা গেল। দমবন্ধ করে দেখলো সে, ঘাসের মাথা ফাঁক হচ্ছে, বেরিয়ে এলো একটা চকচকে নল। নলের মুখ ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে।

খসখসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'কেউ নড়বে না!'

ঘাসবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা মানুষটা। ডাক্তার হ্যালোয়েন। আস্তে করে আরেক পা বাড়ালেন। আরেকটু উঁচু হলো হাতের রাইফেলের নল। ট্রিগারে আঙুল।

অকস্মাৎ, একসংগে ঘটলো কয়েকটা ঘটনা। তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার করে উঠলো চিতা। গর্জে উঠলো রাইফেল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ছেলেরা। ধুপ করে তাদের কয়েক ফুট দূরে এসে লাফিয়ে নামলো চিতাটা। পড়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পা নাড়লো, মুখ খিঁচলো, শিহরণ উঠলো শক্তিশালী পেশীতে, তারপর নিথর হয়ে গেল কুচকুচে কালো দেহটা।

এগিয়ে এলেন ডাক্তার। তার মুখে রাগ আর হতাশার মিশ্রণ। ময়লা বুটের ডগা দিয়ে আলতো খোঁচা দিলেন চিতার গায়ে।

'তোমাদের ভাগ্য ভালো, গুলিটা জায়গামতো লেগেছে,' বললেন তিনি।

'গুলি···মানে···ওটা কি···,' ঠিকমতো কথা বেরোচ্ছে না মুসার মুখ দিয়ে।

'হ্যাঁ, মরে গেছে,' তার কথাটা শেষ করে দিলেন ডাক্তার। 'আসল বুলেট। কল্পনাও করিনি কখনও, কলিনসের কোনো জানোয়ারকে খুন করতে হবে,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি।

জানোয়ারটার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরালো কিশোর, ঢোক গিললো। 'থ্যাংকস, ডকটর। ওটা বেরোলো কিভাবে?'

'আমারই দোষ,' এবার মাথা নাড়লেন তিনি। 'অনেক দূর থেকে এসেছে, ভাবলাম, ভালোমতো চেকাপ দরকার। বাইরে থেকে ডার্ট ছুঁড়লাম। ঠিক ওই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলো ওটা। লাগলো না ডার্ট। আবার ছুঁড়তে যাবো, এই সময় খাঁচার দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ওটা। অবাক হয়েছি, কিন্তু দাঁড়ালাম না। দিলাম দৌড়, জীপ থেকে রাইফেল আনতে। অস্ত্র সংগে রাখি। বিপজ্জনক জানোয়ার নিয়ে কাজ করি, কখন দরকার পড়ে। এই এখন…,' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

'তারমানে খাঁচার দরজা খুলে রেখেছিলো কেউ?' কিশোরের প্রশ্ন। 'ওরকম একটা কাজ কে করতে যাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। যে করবে তারও তো বিপদের ভয় আছে। দরজা খুলে যদি তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো চিতাটা? আমার মনে হয়, তালা ঠিকমতো লাগেনি।'

'ডার্ট তো কতোই ছুঁড়েছেন। এতো কাছ থেকে মিস করলেন কেন?'

সরু হয়ে এলো ডাক্তারের চোখের পাতা। 'বললাম না, লাফিয়ে উঠেছে। কপাল, বুঝলে, সবই কপাল। মরবে তো, তাই…' ধরে এলো তাঁর গলা।

চিতাটার ওপর ঝুঁকলো মুসা। 'মেরে ফেলা ছাড়া কি আর কোনো উপায় ছিলো না?'

'আর কি করতে পারতাম? ভয়ানক খুনী। আবার ডার্ট ছুঁড়তে পারতাম। কিন্তু ওষুধের ক্রিয়া শুরু হতে সময় লাগতো। ওই সময়ের মাঝেই সর্বনাশ করে ফেলতো।' হঠাৎ যেন মনে পড়লো তাঁর, 'তা তোমরা এখানে কি করছো? কলিনস তো বললো শূটিং দেখতে গেছো।'

'গিয়েছিলাম,' আমতা আমতা করলো কিশোর। 'ভাবলাম, এদিকে একবার ঘুরে যাই…'

এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'কলিনসের কাছে শুনলাম, তোমরা গোয়েন্দা। তদন্ত করতে এসেছো নিশ্চয়? কিছু পেলে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না। সবই এখনও রহস্য।'

'তোমাদের দোষ দেবো কি? আমিই অবাক। একের পর এক রহস্যময় ঘটনা ঘটে চলেছে এখানে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা রহস্যের কথা শুনবে?'

তিন জোড়া চোখেই আগ্রহ ফুটলো।

ঠোঁটে সিগারেট লাগালেন ডাক্তার। দেশলাই বের করে ধরালেন। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে থুথু ফেললেন মাটিতে। তারপর সিগারেটটা দুই আঙুলের ফাঁকে নিয়ে বললেন, 'বলছি। যতোবার, তোমরা ছেলেরা এখানে আসো, একটা করে জানোয়ার ছাড়া পায়। ভালো করে ভেবে দেখো। বোঝা যায় কিছু?'

একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।

জোরে হেসে উঠলেন ডাক্তার। 'ঠিক বলিনি?' চিতাটার গায়ে লাথি মারলেন। 'এটাকে সরানো দরকার। ঠিক আছে, পরে হবে। শোনো, তোমাদেরকে একটা উপদেশ দিয়ে রাখি...'

'কি, স্যার?' মিনমিন করে বললো রবিন।

'সাবধানে থাকবে।'

বলে আর দাঁড়ালেন না। ঘুরে, হেঁটে গিয়ে ঢুকে পড়লেন লম্বা ঘাসের ভেতরে।

ষোলো

দুই সহকারীকে নিয়ে ইয়ার্ডের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো গোয়েন্দাপ্রধান। কয়েক একর জায়গা জুড়ে পড়ে আছে লোহা লক্কর, অধিকাংশই গাড়ির ভাঙাচোরা বডি।

'এখানে কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'চোরাই হীরাগুলো খুঁজবো,' জবাব দিলো কিশোর। 'ভিকটরের ফেলে দেয়া খাঁচাটাও।'

'হীরাগুলো এখনও খাঁচার মধ্যে রয়েছে ভাবছো?' রবিন প্রশ্ন করলো।

'যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক দিন আগে ফেলা হয়েছে খাঁচাটা। তবে একটা আইডিয়া হয়তো পেতে পারি দেখলে।'

'কিন্তু কিশোর,' মুসা বললো, 'খাঁচায় থাকলে কোথায় থাকবে? তোমার কি ধারণা, থলেয় ভরে বেঁধে দেয়া হয় কোনো কোণাটোনায়?'

'বলতে পারবো না, মুসা। আমার মনে হয়, ডেইমিং আর ডারেলও জানে না, কোথায় রাখা হয় হীরাগুলো। জানলে এতোদিনে পেয়ে যেতো।'

'ওরা কাল রাতে অনেক খুঁজেছে,' রবিন বললো, 'পায়নি। আমরা পাবো, এটা আশা করছো কিভাবে?'

'আমরা খুঁজবো দিনের আলোয়। অন্ধকারে অনেক কিছুই চোখ এড়িয়ে যায়।'

'স্রেফ পাগলামি,' বিড়বিড় করলো মুসা।

নির্জন ইয়ার্ড।

কিশোর বললো, 'এইই সুযোগ। চলো।'

আগের রাতে বেড়াটা যে-জায়গায় নামানো হয়েছিলো, সেখানে এসে দাঁড়ালো ওরা। সহজেই ঠেলে আবার নামিয়ে দিলো খুঁটি। হেঁটে চলে এলো তারের জালের ওপর দিয়ে। চত্বরে ঢুকে গুড়ি মেরে এসে থামলো ভাঙাচোরা বডির স্তূপের কিনারে।

কান ঝালাপালা করা খনখনে ধাতব আওয়াজ উঠলো ইয়ার্ডের অন্যধারে। সেই সঙ্গে বিরক্তিকর যান্ত্রিক গোঙানি, শিস, আর্তনাদ।

'চলো দেখি,' প্রস্তাব দিলো কিশোর, 'মেটাল শ্রেডার কি করে কাজ করে।'

বিরাট এক ক্রেন দেখা গেল, কয়েক শো' গজ দূরে। কন্ট্রোলহাউসটা আরও দূরে। প্রতিবাদ জানিয়ে গুঙিয়ে উঠলো যেন যন্ত্র। মস্ত এক যান্ত্রিক থাবা নেমে আসতে লাগলো স্তূপের ওপরে।

জঞ্জালের ওপর ঘটাং করে পড়লো থাবাটা। ধাতব আঁকশিতে করে তুলে নিলো একটা বডি। শূন্যে উঠে গেল। দুলছে। ওটাকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো আঁকশি। ধুপ করে পড়লো বডিটা, তারপর শুরু হলো বিচিত্র হুপ-হুপ-হুপ শব্দ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে বডি।

'কনভেয়র বেল্ট,' একটা বডির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে মুসা। 'শেড-এ নিয়ে যাচ্ছে।'

শেড-এর মুখে পৌঁছে থামলো বেল্ট, ক্ষণিকের জন্যে। তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ছুঁড়ে ফেললো বডিটাকে, হা করে থাকা দানবের পেটে। চালু হয়ে গেল যান্ত্রিক দানবের চোয়াল, দাঁত। আর্তনাদ শুরু করলো গাড়ির বডি। বোঝা যাচ্ছে, পিষে ফেলা হচ্ছে ওটাকে।

'খাইছে!' শিউরে উঠলো মুসা। 'শুনে মনে হয়, জ্যান্ত চিবিয়ে খাচ্ছে!'

আবার নড়তে শুরু করেছে ক্রেনের আঁকশি।

আরেকটা বডি তুলে নিয়ে গিয়ে ফেললো বেল্টের ওপর। বেল্ট সেটাকে নিয়ে গেল শেড-এ। আবার চিবানো আর আর্তনাদের পালা। এতো বিশ্রী শব্দ, গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়।

'বুঝলাম, কিভাবে কাজ করে,' বললো কিশোর। 'এসো, এবার আমাদের কাজ শেষ করি।'

খুঁজলো কিছুক্ষণ ওরা। পেলো না কিছুই।

'কি খুঁজছি জানলে আরও সহজ হতো,' ধাঁ করে ধাতব একটা জিনিসে লাথি মারলো মুসা।

'সেকেণ্ড, চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর, 'কি ওটা?' বলতে বলতেই ছুটে এসে তুলে নিলো।

'দেখে তো মনে হয় এককালে খাঁচার অংশ ছিলো,' মন্তব্য করলো রবিন।

'কি করে বুঝলে?' মুসা বললো। 'দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। শিকটিক কিছুই তো নেই।'

'সব কিছু ভর্তা করে দিয়েছে হয়তো মেটাল শ্রেডার,' বললো কিশোর। 'ভুলে যাচ্ছো কেন, যন্ত্রটা কম্পিউটার। ধাতু চেনে। আলাদা আলাদা করে ফেলে।'

'অ্যাঁ, তাই তো?' পরক্ষণেই প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লো যেন মুসা, কতগুলো

জঞ্জালের ভেতর থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনলো একটা লোহার শিক।

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলো কিশোর। নাচ জুড়ে দেবে যেন এখুনি। 'এটাই···এটাই বোধহয় খুঁজছি আমরা। দেখি।'

কিশোরের হাতে দিলো ওটা মুসা।

'আরে, সাংঘাতিক ভারি তো। দেখে এতোটা মনে হয় না।' চকচকে চোখে শিকটা দেখছে কিশোর। 'আরেকটা যে আছে, যেটা পেয়েছি···' হাঁ হয়ে গেল হঠাৎ।

'কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'অ্যাঁ?···' শিকটা কাঁধে ফেললো কিশোর। 'কুইক! বেরিয়ে যাওয়া দরকার।'

'এতো তাড়া কিসের?' মুসা বললো। 'একটা পেয়েই যখন এতো খুশি, আরও খুশি করতে পারি তোমাকে। দাঁড়াও, আরও কয়েকটা শিক খুঁজে দিই।'

চলতে শুরু করেছে কিশোর। 'অন্যগুলো এটার মতো হবে না।'

'কি আছে এটাতে?'

জবাব দিলো না কিশোর। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বেড়ার দিকে।

কাজ সেরে ফেরার পথে জাঙ্গল ল্যাণ্ড থেকে তিন গোয়েন্দাকে তুলে নিলো বোরিস।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কিশোর। পথে তার সংগে একটা কথাও হলো না রবিন আর মুসার।

ইয়ার্ডে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে সোজা ওয়ার্কশপের দিকে ছুটলো কিশোর। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'নেই!'

'কি নেই?' পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন।

'লোহার শিক, যেটা গতরাতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। দরজায় লাগানোর জন্যে যেটা রেখেছিলাম, সেটাও নেই!'

'এখানেই তো রেখেছিলে,' মুসা বললো। 'গেল কোথায়? কিন্তু সাধারণ শিকের জন্যে এমন করছো কেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো কিশোর। 'দেখি, চাচাকে জিজ্ঞেস করে।'

চত্বরের একধারে বসে আরামে পাইপ টানছেন রাশেদ পাশা। ছেলেদের দেখে মুখ তুললেন।

'চাচা, ওয়ার্কশপে একটা লোহার ডাণ্ডা ছিলো···,' শুরু করলো কিশোর।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত তুললেন রাশেদ পাশা। 'যতো ডাণ্ডা আর শিক আছে সব খুঁজে নেয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'কেন?' হাসলেন রাশেদ পাশা। 'অবশ্যই খাঁচাগুলো মেরামতের জন্যে। তোর

চাচী আর রোডার গিয়ে খুঁজে আনলো। একটা লোক এসেছিলো, খাঁচা কিনতে। খুবই নাকি দরকার তার। জরুরী। কি আর করবো। যতো ডাণ্ডা, শিক পেয়েছি, জোগাড় করে মোটামুটি মেরামত করে দিয়েছি খাঁচাগুলো।'

'কে এসেছিলো?' মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের। 'কাল যে কোদালমুখোটা এসেছিলো, সে?'

'না, আরেকজন। ভালো লোক। এতোই মুগ্ধ করে ফেললো আমাকে, কি বলবো, মন পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। সার্কাস পার্টিকে না দিয়ে তাকেই দিয়ে দিলাম। কথাবার্তা, ব্যবহার খুব ভালো লোকটার।'

হতাশ ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়লো কিশোর।

জোরে জোরে পাইপে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ পাশা। 'জানিস, চারটে খাঁচার জন্যে কতো দিয়েছে? চারশো ডলার!'

'চাচা, শ্যাটউইক ভ্যালি থেকে এনেছিলে খাঁচাগুলো, না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। আরেকটা স্যালভিজ ইয়ার্ড, তবে ভিন্ন ধরনের, ঠিক আমাদেরটার মতো না। ওদের মূল ব্যবসা গাড়ির বডি জোগাড় করে ধাতু আলাদা করা। তারপর চড়া দামে বিক্রি করে।'

উঠলেন রাশেদ পাশা। অফিসের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, ডাকলো কিশোর, 'চাচা, এক মিনিট। লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?'

হাসলেন তিনি। 'জিজ্ঞেস করতে হয়নি, নিজে নিজেই বলেছে। কলিনস। উইলবার কলিনস। জন্তুজানোয়ার নাকি পালে, সেজন্যে খাঁচা দরকার।'

সতেরো

ফোনে হ্যানসনকে পাওয়া গেল। রোলস রয়েস নিয়ে তাকে আসার জন্যে অনুরোধ করলো কিশোর।

গাড়ি আসতে আসতে তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে নিলো তিনজনে।

গাড়িতে উঠে বসে রবিন বললো, 'কিশোর, এইবার বলো, এসবের মানে কি?'

'খুব সহজ,' জবাব দিলো কিশোর। 'লোহার শিকের ভেতরে ভরে হীরা চোরাচালান করছে কলিনসরা।'

'তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো, কিশোর?' মুসা বললো। 'ইয়ার্ডে যেটা কুড়িয়ে পেয়ে দিলাম তোমাকে, ওরকম শিকের কথা বলছো?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'কিন্তু ওটাতো নিরেট লোহা। ওর ভেতরে ভরে হীরা আনে কিভাবে?'

'নিরেট হলে পারবে না, কিন্তু ভেতরে ফাঁপা হলে? মনে আছে, শিকটা হাতে নিয়ে বলেছিলাম, বেজায় ভারি? গতরাতে যেটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার চেয়ে তোমারটা ভারি। তারমানে তোমারটা নিরেট।'

'কিন্তু বুঝলে কি করে শিকের ভেতর হীরা আছে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'প্রথমে শুধুই সন্দেহ ছিলো। যখন শুনলাম, উইলবার কলিনস এসে খাঁচাগুলো কিনে নিয়ে গেছেন, শিওর হয়ে গেলাম। ভেতরে দামী কিছু না থাকলে এতো আগ্রহ দেখিয়ে এতো টাকা দিয়ে ওই ভাঙা খাঁচা কিনতে আসতেন না কলিনস। কপাল খারাপ আমার, শিকটা হাতে পেয়েও হারিয়েছি। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, এতো দেরিতে খাঁচাগুলো কিনতে এলেন কেন কলিনস?'

'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না,' মাথা নাড়লো মুসা। 'জানেনই যদি ওগুলোর ভেতরে হীরা আছে, প্রথমে ফেলে দিয়েছিলেন কেন?'

'পরিস্থিতি খারাপ ছিলো হয়তো তখন। কিংবা নিশ্চয় কোনো কারণ ছিলো। 'তাই, বেড়ার ওপাশে ইয়ার্ডে ফেলে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সময়-সুযোগমতো আবার তুলে এনে হীরাগুলো বের করে নেবেন। কিন্তু কোনোভাবে খাঁচাগুলো ইয়ার্ডের অন্য খাঁচার সংগে মিশে যায়। ওগুলো কিনে নিয়ে আসেন রাশেদচাচা?'

'এটা সম্ভব,'মাথা দোলালো রবিন। 'তারপর হয়তো ইয়ার্ডের লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন কলিনস, কে কিনেছে খাঁচাগুলো। নাম ঠিকানা জোগাড় করেছেন। খোঁজখবর করতেই দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা ব্যাপার, ডেইমিং আর ডারেল জানে হীরাগুলোর কথা। সে-কারণেই ডেইমিং যখন গিয়েছিলো তোমাদের ইয়ার্ডে, লোহার পাইপ, ডাণ্ডা, এসব জিনিসের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'আমি ভাবছি,' আবার বললো রবিন, 'অন্য খাঁচাগুলোও ওরাই কিনে নিলো না তো?'

'অন্য খাঁচা?' মুসা বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ। মেরিচাচী যেগুলো বিক্রি করেছেন? আমরা তখন জাঙ্গল ল্যাণ্ডে ছিলাম।'

'নাহ্, ওগুলোতে ছিলো না,' বললো মুসা। 'ওগুলো অনেক বেশি লম্বা ছিলো, খাঁচার শিক না। ভারিও অনেক বেশি। ওগুলো নিখাদ লোহা।'

'আমারও তাই ধারণা,' একমত হলো কিশোর। 'ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। যে খুশি কিনুকগে।'

'কিশোর,' মুসা মুখ ফেরালো, 'গতরাতে যে শিকটা পেলে, ওটা ওখানে বনের মধ্যে এলো কোত্থেকে? কিভাবে?'

'হতে পারে, আলগা ছিলো। কলিনস যখন খাঁচাটা তুলে ইয়ার্ডে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, শিকটা তখনই কোনোভাবে খুলে পড়ে গেছে। খেয়াল করেননি তিনি।'

'তা নাহয় হলো,' বললো রবিন। 'কিন্তু খাঁচা এসেছে কয়েকটা, তাতে শিকও অসংখ্য। কলিনস বুঝলেন কি করে, কোনটাতে কোনটাতে আছে হীরা?'

'উপায় আছে,' মুচকি হাসলো কিশোর।

'কিভাবে?'

হঠাৎ জানালার দিকে মুখ ফেরালো কিশোর। রবিন বুঝলো, পেটে বোমা মারলেও এ-সম্পর্কে আর একটা কথা বের করা যাবে না এখন গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ থেকে। তার স্বভাব ওরকমই। কিছু কিছু কথা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখে সে, কিছুতেই ভাঙতে চায় না। কেন, সে-ই জানে।

বিরক্তিতে মুখ বাঁকালো রবিন। 'আসল রহস্যটাই এখনও বাকি। যেটার তদন্ত করতে গিয়েছিলাম আমরা। ভিকটরকে নার্ভাস করলো কে? ছাড়লো কে?'

'শীঘ্রি সেটা জানতে পারবো,' বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বললো কিশোর। 'হতে পারে, মিস্টার কলিনসই ছেড়েছেন। তারপর নিজেই খুঁজতে বেরিয়েছেন। ভাবখানা, যেন তিনি কিছুই জানেন না।'

'কেন করবেন এরকম?' কথা ধরলো মুসা। 'সব তালগোল পাকানো। কোনোটাই স্পষ্ট হচ্ছে না আমার কাছে।'

'আজ সকালের কথাই ধরো,' মুসার সুরে সুর মিলিয়ে বললো রবিন। 'ভিকটরকে নিয়ে মিস্টার কলিনস ছিলেন সেটের কাছে। আমরা দেখেছি। চিতার খাঁচার দরজা খোলা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। কে খুললো? আবার ওদিকে ডাক্তার বললেন, দোষটা তাঁর।'

'হতে পারে,' জবাব দিলো কিশোর, 'ডাক্তারও সব জানেন। কলিনসকে; হয়তো বা ডিককেও, বাঁচানোর জন্যে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন।'

জাঙ্গল ল্যাণ্ডে পৌঁছলো গাড়ি।

নেমে সাদা বাড়িটার দিকে এগোলো ছেলেরা।

'বড় বেশি নীরব,' হাঁটতে হাঁটতে বললো মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। কথা বললো না।

আরও খানিক দূর এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'কি যেন শুনলাম?' কান পেতে রয়েছে কিশোর। 'আবার কোনো খাঁচার দরজা খোলা নয় তো? দেখেশুনে কাছে যাওয়া উচিত।'

বাড়ির কিনারের খালি জায়গার দিকে এগোলো ওরা। ঘাসবন আর ঝোপঝাড়ের

কিনার ঘেঁষে চলছে।

'বেশি নীরব…,'

কথা শেষ করতে পারলো না কিশোর। তার আগেই বাধা এলো। কি যেন এসে পড়লো মাথার ওপর।

রবিন আর মুসার মাথায়ও পড়লো।

কঠিন হাত চেপে ধরলো ওদের।

মুখ-মাথা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হলো। চিৎকার করলো ওরা, কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল।

জোরাজুরি করলো ওরা, হাত-পা ছুঁড়লো। লাভ হলো না। ধরা পড়লো অচেনা শত্রুর হাতে।

আঠারো

কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু এঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের।

এক জায়গায় এসে থেমে, বন্দিদের গায়ে কম্বল আরও ভালো করে জড়ানো হলো। তার ওপর পেঁচিয়ে বাঁধা হলো দড়ি দিয়ে। তারপর তুলে বয়ে নিয়ে চললো, একজন একজন করে।

কিসের ভেতর যেন ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। বুঝতে পারলো ওরা, নরম গদির ওপর রাখা হয়েছে। খটাং করে দরজা বন্ধ হলো।

চলে যাচ্ছে লোকগুলো, পায়ের আওয়াজ বোঝা গেল। নীরব হয়ে গেল তারপর।

হঠাৎ চালু হলো যন্ত্র, বিকট শব্দ।

ওরা যেটার ভেতরে রয়েছে, তার ওপর এসে পড়লো কি যেন। ঝনঝন, ক্যাঁচম্যাঁচ করে উঠলো। ঝটকা দিয়ে উঠে গেল শূন্যে। হুড়মুড় করে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়লো ওরা।

'আরি!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, মুখে এখন আর চাপ নেই, স্পষ্টই বোঝা গেল কথা। 'ওপরে তুলছে মনে হয়?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো। 'জলদি কিছু করা দরকার আমাদের। কম্বল সরাতে পারলে অন্তত দেখতে পারবো কি হচ্ছে।'

অনেক চেষ্টা করলো ওরা। কিছুই করতে পারলো না। কম্বল পেঁচানো, তার ওপর দড়ি দিয়ে বাঁধা।

'হুপ-হুপ-হুপ-হুপ' শব্দ কানে আসছে।

'মারছে!' মুসা আতঙ্কিত। 'কনভেয়র বেল্টের আওয়াজ! পুরনো গাড়ির ভেতর ভরা হয়েছে আমাদেরকে। ক্রেনের আঁকশি তুলে নিয়েছে গাড়িটা!'

নামিয়ে দেয়া হলো গাড়িটা। দুলুনি বন্ধ হয়ে গেছে। আচমকা 'হুপ' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি!

ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। সেই সাথে এগোচ্ছে ছেলেরা, শেডের মুখের দিকে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে আরেকবার চেষ্টা চালালো ওরা।

বৃথা চেষ্টা।

চলছে বেল্ট, এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ওরা।

যন্ত্রের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল সে চিৎকার, নিজেরাই শুনতে পেলো না ভালোমতো, বাইরের কে শুনবে?

'জলদি নামাও!' শোনা গেল একটা কণ্ঠ। থেমে গেছে যন্ত্রের শব্দ।

টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে বের করে মাটিতে নামানো হলো ওদের।

গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরাতে সোজা ডেইমিঙের চোখে চোখ পড়লো কিশোরের। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ইয়া বড় এক ছুরি দিয়ে মুসার বাঁধন কাটছে ডারেল। আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে কাছেই, পরনে ইউনিফর্ম, মাথায় ধাতব হেলমেট। অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, ইয়ার্ডের মেশিন-চালক সে। চোখে অবাক দৃষ্টি।

'তারপর?' হাসিমুখে বললো ডেইমিং। 'কেমন লাগছে? গেছিলে তো আরেকটু হলেই।'

উঠে বসে মাথা ঝাঁকালো শুধু কিশোর। বোকা হয়ে গেছে যেন।

মুক্ত হলো রবিন আর মুসাও। শরীরের এখানে ওখানে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিচ্ছে।

'সময়মতোই এসেছি,' বললো ডেইমিং। 'কি হয়েছিলো? কি করেছিলে?'

'কারা যেন কম্বল ছুঁড়ে ফেললো আমাদের মাথায়,' ডেইমিঙের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললো কিশোর। 'আর কিছুই দেখলাম না। তারপর বেঁধে নিয়ে এলো এখানে। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের বাঁচানোর জন্যে।'

'কারা এনেছে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'এতো দ্রুত ঘটে গেল সব, কিছুই দেখার সময় পাইনি। উইলবার কলিনসের বাড়ির কাছে...,' থেমে গেল সে। 'আপনারা কি করে জানলেন

আমরা এখানে আছি?'

'কাছাকাছিই ছিলাম আমরা,' বললো কোদালমুখো। সঙ্গীকে দেখিয়ে বললো, 'ডারেল হঠাৎ বললো, পুরনো গাড়িতে কি ভরতে দেখেছে সে। দেখতে এলাম। দেখি, লোকগুলো পালিয়ে যাচ্ছে, মুখে রুমাল বাঁধা। ক্রেনের আঁকশি তুলে নিলো গাড়িটা, আমরা কিছু করার আগেই। দৌড়ে এসে কন্ট্রোল রুমে···'

কেঁপে উঠলো মুসা। 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার! আরেকটু হলেই···' ভয়ে ভয়ে তাকালো শেড-এর মুখের দিকে।

'কারা ধরেছিলো তোমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করলো ডেইমিং। 'কি করেছো তোমরা, যে মেরেই ফেলতে চেয়েছিলো?'

মুখ তুললো কিশোর। 'একটা তদন্ত করছি। কাদের সন্দেহ করছি, নাম বলার সময় আসেনি এখনও।'

হাসলো কোদালমুখো। 'তাই, না? ধরো, আবার কম্বল জড়িয়ে বেল্টে তুলে দেয়া হলো তোমাদের। শেডের ভেতর গিয়ে তখন চমৎকার গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে। দেবো নাকি তুলে?'

আড়চোখে কনভেয়র বেল্টের দিকে তাকালো কিশোর। 'আসলে আপনাদের দু'জনকেও সন্দেহ করেছি আমরা। তবে, এখন বুঝতে পারছি, হীরা চোরাচালানের সঙ্গে আপনারা জড়িত নন, তাহলে আমাদের বাঁচাতেন না।'

সঙ্গীর দিকে ফিরে ভুরু নাচিয়ে বললো ডেইমিং, 'কি ডারেল, বলিনি ছেলেটা ভীষণ চালাক? জেনে ফেলেছে সব।' কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলো। 'তো ইয়াং ম্যান, আশা করি এবার বলবে ওগুলো কোথায় আছে?'

'বলতে পারবো না। কারণ, জানি না।'

ঝটকা দিয়ে সঙ্গীর দিকে মুখ ফেরালো ডেইমিং। 'খামোখা সময় নষ্ট করছি এখানে। জলদি চলো। দেরি করলে পালিয়ে যাবে ব্যাটারা।'

উনিশ

দরজা খুলে অবাক হলো ডিক। 'আরে, কিশোর, তোমরা?'

'ডেইমিং, আর আরেকজন লোক, ডারেল, এসেছে এখানে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা নাড়লো ডিক। 'না তো। কেন?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। 'চাচা কোথায় ওরা? 'তোমার চাচা তো বাইরে গেছেন, না?'

আবার মাথা নাড়লো ডিক। 'না, ঘরেই তো, ডিকটরের কাছে, শুয়ে আছে। দাঁড়াও, ডাকি।'

ডিক চলে গেলে দুই সহকারীর দিকে তাকালো কিশোর।

'অবাক কাণ্ড!' বললো মুসা। 'আমিও ভেবেছিলাম দু'জনে এখানে এসেছে। গেল কোথায়?'

'বোধহয় খাঁচাগুলো খুঁজতে,' অনুমান করলো রবিন।

'কিসের খাঁচা?' হাসিখুশি একটা কণ্ঠ শোনা গেল। দরজায় দেখা দিলেন কলিনস।

'আপনার পুরনো খাঁচাগুলো, মিস্টার কলিনস,' কিশোরের জবাব।

অবাক হলেন কলিনস। 'কি বলছো?'

'জানার তো কথা আপনার, মিস্টার কলিনস। ডিকটরের ফেলে দেয়া খাঁচাটা, সেই সংগে আরও তিনটে। যেগুলো আজ গিয়ে আমাদের ইয়ার্ড থেকে কিনে এনেছেন।'

কলিনসের চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'আ-আমি!'

'খাঁচাগুলো এনে কোথায় রেখেছেন, মিস্টার কলিনস?' এবার প্রশ্ন করলো রবিন। 'যেগুলোর শিকের ভেতর হীরা লুকানো রয়েছে?'

বুদ্ধু বনে গেছেন যেন, এমন ভাব করে একে একে তিন ছেলের মুখের দিকে তাকালেন কলিনস। 'ওকে, খুলে বলো সব।'

স্বস্তি ফুটলো মুসার চোখে। 'একটা সত্যি কথা অন্তত বলুন। আমাদেরকে বেঁধে মেটাল শ্রেডারে ফেলে দিয়ে আসায় আপনার হাত আছে তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কলিনস। ভাতিজার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলে ওরা?'

চাচার মতোই ডিকও মাথা নাড়লো। 'জানি না।'

'আপনি বলেছিলেন আপনার একটা সমস্যা হয়েছে,' রবিন বললো, 'তাই আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। ডিকটরকে কেউ নাভাস করে—তাই না? অথচ খোঁজ করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো আরেক কিচ্ছা। আপনি আর আপনার ভাই সিলভার, চোরাচালানী দলের সদস্য। জানোয়ারের খাঁচায় করে হীরা পাচার করেন। কোনোভাবে একটা চালান হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই আজ গিয়ে কিশোরদের ইয়ার্ড থেকে চারটে খাঁচাই কিনে এনেছেন।'

'পাগল হয়ে গেছো তোমরা!' এতোক্ষণে রাগলো ডিক। 'আজ সকাল থেকে কাকুর সংগে ছিলাম। জাঙ্গল ল্যাণ্ড থেকেই বেরোয়নি আজ।'

কলিনসের দিকে তাকালো কিশোর। 'বেরোননি?'

মাথা নাড়লেন কলিনস।

'কিন্তু আমার চাচা তো বললো, উইলবার কলিনস নামে একজনের কাছে বিক্রি

করেছে। বোকামি করে ফেলেছি, চেহারা কেমন ছিলো, জিজ্ঞেস করিনি চাচাকে। এখন আন্দাজ করতে পারছি, কে…'

'ডারেল?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হতে পারে।' আবার কলিনসের দিকে তাকালো কিশোর। 'হীরার ব্যাপারে কিছু জানেন না আপনি?'

'তুমি কি বলছো, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'ভিকটরের খাঁচাটা ফেলে দিলেন কেন?'

হাত নাড়লেন কলিনস। 'পুরোপুরি পোষ মানার পর আর খাঁচায় রেখে কি লাভ? জঞ্জাল ফেলার জায়গা যখন বাড়ির কাছেই আছে, দূরে যাওয়ার আর দরকার হলো না। বেড়ার ওপাশে ইয়ার্ডে ফেলে দিলাম।'

'কিন্তু ভিকটরকে ঘরে নিয়ে আসার পরেও অনেকদিন খাঁচাটা ফেলেননি, তাই না?'

'হ্যাঁ। ফ্র্যাঙ্কলিন সিন এসে ভিকটরকে ভাড়া করার কথা বলার পর ফেলেছি। সিংহটা বুনোই রয়ে গেছে, সিন একথা ভাবুক, তা চাইনি।'

চেহারা বিকৃত করে ফেললো কিশোর। 'মাপ চাইছি, মিস্টার কলিনস। অনেক আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি। আমারই বোঝার ভুল।'

'ভুল আমরা সবাই করি, কিশোর। খুলে বলো তো সব, হয়েছেটা কি?'

গোড়া থেকে শুরু করলো কিশোর, একেবারে খাঁচাগুলো তাদের ইয়ার্ডে পৌঁছার সময় থেকে। ডেইমিঙের খাঁচা কিনতে যাওয়ার কথা বলে বললো, 'অথচ ডিক জানালো, ওর নাম জিনজার। সিনের সংগে কাজ করে।' লোকটার চেহারার বর্ণনা দিলো।

'হ্যাঁ, সেটের কাছাকাছি দেখেছি বলে মনে পড়ছে,' বললেন কলিনস।

'গতরাতে ইয়ার্ডে ঢুকেছিলো সে,' জানালো রবিন। 'সংগে আরেকজন ছিলো, নাম ডারেল। চোরাই হীরার কথা বলাবলি করেছে ওরা। ওরাই আজ বাঁচিয়েছে আমাদের। আরেকটু হলেই পিষে ফেলতো মেটাল শ্রেডার।'

চুপচাপ সব শুনলেন কলিনস। তারপর বললেন, 'সরি, বয়েজ। কিন্তু বুঝতে পারছি না কিছু। ধরলাম, হীরা চোরাচালান হয়ে আসে এখানে। তবে,' তর্জনী নেড়ে বললেন, 'একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি। আমার ভাই সিলভার নেই এসবে।'

চুপ করে ভাবলো কিছুক্ষণ কিশোর। 'গত ক'মাসে ক'টা খাঁচা ফেলেছেন, বলবেন?'

'গত ক'মাসে নয়, বছরখানেক আগে গোটা তিনেক ফেলেছি। শেষ ফেলেছি ভিকটরের খাঁচাটা। মাঝে আর একটাও না।'

'তাহলে ওই খাঁচাটা দিয়েই শুরু। আচ্ছা, ভিকটর কেমন আছে আজ?'

হাসলেন কলিনস। 'ভালো, খুব ভালো। চমৎকার অভিনয় করেছে। ভালো শূটিং। সিন খুব খুশি। ঘরে শুয়ে এখন ঘুমাচ্ছে সিংহটা। খানিক আগে ডাক্তার এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।'

সহকারীদের দিকে ফিরলো কিশোর। 'যাওয়া দরকার। কাজ আছে, চলো।'

এগিয়ে দিতে এলো ডিক। হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'দরকার পড়লে আবার এসো। চাচা কিছু মনে করেনি…'

'করলেও দোষ দেয়া যাবে না তাঁকে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছি। তোমার কাছেও মাপ চাইছি, ডিক।'

'আরে, দূর, কি যে বলো।'

একটা আলগা পাথরে পা পিছলে হঠাৎ আছাড় খেলো কিশোর। উঠে বসলে দেখা গেল, হাত ঝাড়ছে। কড়ে আঙুল মুখে দিয়ে চুষলো। কোনো কিছুতে লেগে কেটে গেছে আঙুলের মাথা।

'কি হলো? বেশি লেগেছে?' ঝুঁকে এলো ডিক।

'না, সামান্য…'

'সামান্য কোথায়? রক্ত বেরোচ্ছে। চলো, ঘরে চলো ওষুধ লাগিয়ে দিই।'

ঘরে ঢুকে ডিক বললো, 'ডাক্তার চাচা থাকলে ভালো হতো। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে পারতো। …আরে, তার ব্যাগ ফেলে গেছে। কখনও তো এরকম হয় না।'

একটা চেয়ারের ওপর পড়ে আছে বহুব্যবহৃত, পুরনো, মলিন চামড়ার ব্যাগটা। ওটার দিকে স্থির চেয়ে থেকে কিশোর বললো, 'ঠিক আছে, আমিই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিতে পারবো। ব্যাগ ধরলে কিছু মনে করবেন না তো ডাক্তার?'

'আরে না না, কি মনে করবেন? যাও না।'

ব্যাগ খুলে হাত ঢোকালো কিশোর। ব্যাণ্ডেজের কাপড় বের করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো আরেকটা জিনিস। হলদে একটুকরো কাগজ।

'কারও পুরনো প্রেসক্রিপশন বোধহয়, রেখে দাও,' বললো ডিক।

রাখতে গিয়েও লেখার দিকে চোখ পড়ে যাওয়ায় আর রাখলো না কিশোর। বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

'কী?' এগিয়ে এলো রবিন।

কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো কিশোর, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না! কিন্তু…হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি, সবকিছু পরিষ্কার। 'কি বিড়বিড় করছো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'কি পরিষ্কার?'

কাগজটা বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'নিজেই পড়ে দেখো।'

জোরে পড়লো মুসাঃ 'ডক্স রক্স নক্স এক্স রেক্স বক্স।'

'মানে কি এর?' হাত নাড়লো ভিক।

'এর মানে হলো,' কিশোর বললো, 'সবকিছুর পেছনে এমন একজন লোক রয়েছে, যাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি।'

'মানে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন কলিনস। কথা শুনে দেখতে এসেছেন আবার, কারা।

'শুনলে খুব খারাপ লাগবে আপনার,' ঘুরে দাঁড়ালো কিশোর। 'ডাক্তার হ্যালোয়েন।'

হাসলেন কলিনস। 'আবার না বুঝে কথা বলছো, কিশোর। ডাক্তার আমার পুরনো বন্ধু। দেখি, কাগজটা?'

তাঁর হাত বাড়ানো থাকতে থাকতেই দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকলো বিশালদেহী একজন লোক। 'ডাক্তারের ব্যাগ নিতে এসেছি। ভুলে ফেলে গেছেন।' ব্যাগটা খোলা দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। মুসার হাতে হলুদ কাগজের টুকরোটা দেখে জ্বলে উঠলো চোখ। চেঁচিয়ে বললো, 'এই ছেলে, ব্যাগ খুলেছো কেন?' টান দিয়ে কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিলো সে। মুচড়ে দলা পাকিয়ে হাত বাড়ালো ব্যাগের দিকে।

এগিয়ে এলেন কলিনস। 'ব্রড, এক মিনিট...'

চোখের পলকে পিস্তল বেরিয়ে এলো ব্রডের হাতে। 'সরো।' ধমকে উঠলো সে। 'নইলে মরবে বলে দিলাম।'

ঢোক গিললো কিশোর। শুকনো কণ্ঠে বললো, 'তুমিই সেই লোক, যে খাঁচাগুলো আনার সময় মিথ্যে করে উইলবার কলিনসের নাম বলে এসেছো?'

কুৎসিত হাসি হাসলো ব্রড। 'বাহ্, চালাক ছেলে।'

জোরে শিস দিয়ে উঠলেন কলিনস।

নরম মাংসের প্যাড লাগানো ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। চমকে ফিরে তাকালো ব্রড। দরজায় বিশাল সিংহটাকে দেখে কঠিন হলো চোয়াল।

দরজা জুড়ে দাঁড়ালো ভিকটর। হলুদ চোখে আগুন। ধীরে ধীরে লেজ নাড়ছে। চাপা ঘড়ঘড় বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে।

সামান্য সময়ের জন্যে ফিরেছে ব্রড, ওই মুহূর্তটার সদ্ব্যবহার করলো মুসা। ধাঁই করে পাবা মেরে বসলো ব্রডের হাতে, উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। খটাস করে পড়লো মেঝেতে।

গাল দিয়ে উঠলো ব্রড। পিস্তলটার দিকে পা বাড়াতেই বাধা দিলেন কলিনস। 'খবরদার, ব্রড। আর একটা পা বাড়ালেই সিংহের খাবার হয়ে যাবে তুমি। ভিকি?'

জবাবে রক্তপানি করা গর্জন ছাড়লো ভিকটর।

থমকে গেল ব্রড। কুৎসিত মুখটাকে আরও কুৎসিত করে দিলো হতাশা। ধপাশ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

'গুড বয়,' হেঁটে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিলেন কলিনস। ব্রডের কাছে এসে তার মুখের সামনে নেড়ে বললেন, 'এবার মুখ খোলো তো, বাপু। চোরাই হীরার গল্প শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা।'

বিশ

'ওই যে, ডাক্তারের বাড়িঘর,' হাত তুলে একটা গোলাবাড়ির ওপাশে ছোট বাড়ি দেখালো ডিক, 'ডিসপেনসারি।'

গোলাঘরের কাছ থেকে খটাং খটাং আওয়াজ ভেসে আসছে।

কিশোর হাসলো। 'আমার চাচামিয়ার কাজ তো, ডাক্তার আন্দাজ করতে পারেনি।'

'মানে?' ডিক বুঝতে পারলো না।

'চলো, নিজের চোখেই দেখবে।'

গোলার পাশে ডাইভওয়েতে লরিটা দাঁড়িয়ে আছে। হুডখোলা জীপটাও। পাশে পড়ে আছে চারটে খাঁচা। একটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার, এক হাতে হাতুড়ি, আরেক হাতে প্লায়ার্স।

পায়ের আওয়াজে ফিরে তাকালো সে। ভুরু কোঁচকালো। 'কি হয়েছে, উইলসার? কোনো গোলমাল?'

মাথা ঝাঁকালেন কলিনস। কালো ব্যাগটা ডাক্তারের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'ব্যাগটা নাকি খুঁজছিলে? ফেলে এসেছিলে আমার ঘরে।'

'হ্যাঁ। থ্যাংকিউ। কিন্তু ব্রডকে তো আনতে পাঠিয়েছিলাম। ও গেল কোথায়?' খাঁচার দিকে চেয়ে বিরক্তি ফুটলো ডাক্তারের চোখে। 'আমি একা পারছি না। ওকে দরকার।'

'একটা জরুরী কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি,' বললেন কলিনস। 'আমরা সাহায্য করি? কি করতে হবে?'

হাতের হাতুড়ির দিকে তাকালো ডাক্তার। 'শিকগুলো শক্ত কিনা শিওর হয়ে নিচ্ছি। আর দুর্ঘটনা চাই না। এরপর কোনো জানোয়ার ছুটলে সোজা গিয়ে আদালতে উঠবে সিন।'

হাসলেন কলিনস। 'থ্যাংকস, ডাক্তার। আমার জন্যে অনেক ভাবো তুমি।'

কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কোন শিকে, বের করতে পারবে?'

'আশা করি,' মাথা কাত করলো কিশোর। 'হাতুড়িটা লাগবে।'

'ডাক্তার,' কলিনস বললেন, 'তোমার হাতুড়িটা দাও তো ওকে।'

দ্বিধা করলো ডাক্তার। হাতুড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি করবে?'

'ওরা গোয়েন্দা,' তিন কিশোরকে দেখালেন কলিনস। 'ওদের আমিই ডেকে এনেছি। ভিকটর কেন নার্ভাস হয়ে যায়, তদন্ত করে দেখার জন্যে। ওরা এসে আজগুবী গল্প শোনালো আমাকে, চোরাই হীরার কারবার নাকি চলছে এখানে।'

'আজগুবীই,' মলিন দেখালো ডাক্তারের হাসি। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় আছে হীরা?'

'দয়া করে যদি একটু সরেন, স্যার,' অনুরোধ করলো কিশোর।

'নিশ্চয়,' সরে জায়গা করে দিলো ডাক্তার। 'দেখো, জোরে বাড়ি মেরো না। শিকটিক খুলে ফেলো না আবার। অনেক কষ্টে টাইট দিয়েছি।'

'আপনি দেননি,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'দিয়েছে আমার চাচা, আর রোভার।'

বিস্মিত হলো ডাক্তার।

'দেখছেন না, কি আটকান আটকেছে,' আবার বললো কিশোর। 'কাস্টোমারের কমপ্লেন শুনতে রাজি না চাচা। কাজ যা করবে, তাতে খুঁত থাকতে দেবে না।'

'ইনটারেসটিং,' বললো ডাক্তার।

'সেজন্যেই এতো পিটিয়েও এখনও আলগা করতে পারেননি।' তিনটে শিক দেখালো কিশোর। বাড়ি লেগে বাঁকা হয়ে গেছে। এক এক করে প্রত্যেকটা শিক ঠুকে দেখলো সে। ফিরে চেয়ে বললো, 'এটাতে দুটো আছে।'

কলিনসের দিকে চেয়ে বললো ডাক্তার, 'ছেলেটা কি বলছে?'

'দেখি, কি করে ও,' জবাব দিলেন কলিনস।

'বেশির ভাগ শিকই মরচে ধরা,' নাটক করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না কিশোর। 'তারমানে দীর্ঘদিন বাইরে রোদবৃষ্টির মধ্যে পড়ে ছিলো। মিস্টার কলিনসের ফেলে দেয়া যে কোনো খাঁচার শিক হতে পারে ওগুলো। এই যে এই শিকটা, এটাও মরচে ধরা। এর ভেতরটা ফাঁপা।' হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিলো। 'বাড়ি দিলে দেখছেন কেমন আওয়াজ করে? এটা ভিকটরের খাঁচা থেকে এসেছে।

'আর এই যে, এটা,' খাঁচার আরেক দিকে গিয়ে আরেকটা শিকে বাড়ি দিলো কিশোর, 'এটাও ফাঁপা। এর গায়ে মরচে নেই। তারমানে এটা বাইরে পড়ে থাকেনি খুব একটা। নতুন এসেছে। এটা গরিলার খাঁচার শিক। গরিলাটা যে রাতে এসেছে, খাঁচা থেকে শিকটা সেই রাতেই খুলে নিয়েছে ব্রড। এটা যেখানে ছিলো, তার পাশের দুটো শিক বাঁকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো গরিলাটা। আমার ধারণা, ব্রডের পিছু

নিয়েছিলো। ভয় পেয়ে যায় ব্রড। দৌড়ানোর সময় হাত থেকে ফেলে দেয় শিকটা। ভয়ে ছোটার সময় আমি আছাড় খেয়ে পড়ি ওটার ওপর।'

'কিন্তু ব্রড জানলো কি করে, এটা তোমার হাতে পড়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ডিক।

'কাল রাতে ওর তাড়া খেয়েই তো দৌড়াচ্ছিলাম। পড়লাম আছাড় খেয়ে। হাতে ঠেকলো শিকটা। তুলে নিলাম। আমার হাত থেকে এটা কেড়ে নেয়ার জন্যেই আরও জোরে দৌড়াচ্ছিলো ব্রড, তখন বুঝতে পারিনি। এটা তুলে নিয়েছিলাম আত্মরক্ষার জন্যে, একটা অস্ত্র। আমি এটা নিয়ে গেছি, পরে ব্রড নিশ্চয় বলেছে ডাক্তার হ্যালোয়েনকে। ডাক্তার আমাদের ঠিকানা দিয়েছে, মানে ইয়ার্ডের ঠিকানা। ওখানে গিয়ে শুধু এই শিকটাই নয়, আরও খাঁচা দেখেছে ব্রড। কিনে নিয়ে এসেছে সব। এমনিতেও খুঁজছিলো ওগুলো।'

'এর ভেতরেই আছে, এতো শিওর হচ্ছো কেন?' বললো ডিক।

'হচ্ছি না তো। আন্দাজ করছি। খুললেই বুঝতে পারবো। তবে পাবো আশা করি, সংকেতের সংগে মিলছে তো।'

'যেমন?'

'প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা আর করলাম না। মোটামুটি ধরে নেয়া যায়ঃ বল্প হয়েছে, সিংহের খাঁচায় আছে হীরাগুলো। বের করে নাও। এটা, আগের মেসেজ। গরিলার খাঁচা পাঠানোর পর নিশ্চয় নতুন মেসেজ পাঠানো হয়েছে, তাই না ডাক্তার সাহেব?'

জবাব শোনার অপেক্ষায় না থেকে বলে গেল কিশোর, 'গতরাতে খাঁচাটাকে কিভাবে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করেছিলো ডাক্তার, মনে আছে? চিতার খাঁচাটাও। প্রতিটি শিক। তখনই অদ্ভুত লেগেছিলো ব্যাপারটা, কিন্তু সন্দেহ করিনি কিছু। আসলে, ওভাবে ঠুকে ফাঁপা শিক খুঁজছিলো ডাক্তার।' হ্যালোয়েনের দিকে ফিরলো সে। 'প্লায়ারসটা দেবেন, প্লীজ?'

নীরবে যন্ত্রটা বাড়িয়ে দিলো ডাক্তার।

একটা ফাঁপা শিকের মাথার কাছটা প্লায়ারস দিয়ে চেপে ধরে জোরে মোচড় দিলো কিশোর। কয়েকবার মোচড়াতেই প্যাঁচ খুলে গেল। শিকের নিচের দিকের প্যাঁচও ওভাবে খুললো সে। চ্যাপ্টা লোহার বারের সংগে স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে শিকের দুই মাথা। ওগুলো খুলে শিকটা খুলে আনলো সে। সবাই ঘিরে ধরলো তাকে। আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

দেখা গেল, বিশেষ ধরনের ক্যাপ লাগানো রয়েছে শিকের মাথায়। একদিকে। প্লায়ারস দিয়ে চেপে ধরে ওই ক্যাপ খুললো কিশোর। খোলা মাথাটা কাত করতেই ভেতর থেকে হড়হড় করে পড়লো হলদেটে অনেকগুলো পাথর।

'ওগুলো হীরা?' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'আনকাট ডায়মণ্ড, অর্থাৎ, আকাটা হীরা। খনি থেকে তুলে সোজা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'খাইছে! টনখানেকের কম হবে না!'

'বেশি বাড়িয়ে বলো তুমি,' পাথরের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'টন কি এতো সোজা? কাল রাতে ডেইমিং বলেছিলো, ছ'শো কে, মনে আছে? তারমানে, কে দিয়ে ক্যারাট বোঝাতে চেয়েছিলো। এক ক্যারাটের বর্তমান বাজার দর মোটামুটি দুই হাজার ডলার যদি ধরি, তাহলে এখানে যা আছে, কাটার খরচ বাদ দিয়ে, আমার অনুমান, পাঁচ লাখ ডলারের কম হবে না। আরেকটা শিক থেকে যা বেরোবে, তা-ও যদি পাঁচ হয়, তাহলে হবে দশ লাখ ডলার। একথাই বলেছিলো কাল রাতে, ডেইমিং।'

পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন কলিনস, 'তোমার এই কাজ, ডাক্তার!

সাড়া নেই।

ফিরে তাকালো সবাই। কোথায় ডাক্তার? সকলের অলক্ষ্যে চলে গেছে। জীপের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

'পালাচ্ছে তো!' চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিলো মুসা।

পিছিয়ে এসে পথের দিকে নাক ঘোরালো জীপ। ঠিক ওই সময় বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এলো দুটো গাড়ি। জীপের পথরোধ করলো।

জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে বনের দিকে দৌড় দিলো ডাক্তার।

দুই গাড়ি থেকে নামলো দু'জন লোক। ডাক্তারের পিছু নিলো।

'ডেইমিং!' চিৎকার করে বললো রবিন। 'ডারেল!'

পালাতে পারলো না ডাক্তার। ধরে নিয়ে এলো তাকে দুই আগন্তুক।

'এই যে, ওনার কথাই বলেছিলাম,' কলিনসকে বললো কিশোর। 'ওনার নাম ডেইমিং।'

'না না, জিনজার,' প্রতিবাদ করলো ডিক।

হেসে মাথা নাড়লো কোদালমুখো। 'দু'জনেই ভুল। আমার নাম আসলে মাইকেল হ্যামার।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিলো, পরিচয়পত্র।

পড়ে লাল হলো কিশোরের মুখ। 'আপনি কাস্টমসের লোক। আমি ভেবেছিলাম ডাকাত দলের সদস্য।'

'পাইদের আচরণ অনেক সময়ই লোকের সন্দেহ জাগায়,' হেসে বললেন মাইকেল হ্যামার। 'ওর নাম ডারেল, ঠিকই আছে,' সঙ্গীকে দেখালেন। 'আমেরিকান ট্রেজারীর লোক। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি আমরা, এই চোরাচালানীর দলকে ধরার জন্যে।'

'অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিলো আমাদের ছেলেটা,' পাথরগুলো দেখিয়ে

বললেন ডারেল। 'হীরাগুলো হ্যালোয়েনের হাতে পড়তে যাচ্ছে, আন্দাজ করেছিলাম,' কলিনসের দিকে তাকালেন তিনি, 'ওকে সন্দেহও করেছিলাম। হাতেনাতে ধরতে না পারলে হবে না, তাই অ্যারেস্ট করতে পারছিলাম না। ঠিক কোথায় আছে হীরাগুলো, তা-ও জানতাম না।'

'আরেকটা শিকের ভেতরে পাবেন বাকিগুলো,' কিশোর দেখালো অন্য শিকটা।

'ওর সঙ্গীটা বোধহয় পালালো,' হ্যালোয়েনকে উদ্দেশ্য করে বললেন ডারেল। 'ব্রড।'

'না, পালাতে পারেনি,' জানালেন কলিনস। 'আমার ঘরে, হাত-পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রেখে এসেছি। ডিকটর পাহারা দিচ্ছে।'

'ভি···' চোখ বড় বড় হলো টেজারী-ম্যানের, 'মানে সিংহটা?'

মাথা নুইয়ে সায় জানালেন কলিনস।

হেসে কিশোরের কাঁধে হাত রাখলেন হ্যামার। 'ভেরি গুড, শার্লক হোমস। অর্ধেক পাথর বের করেছো, বাকিগুলো তুমিই বের করে ফেলো।'

প্রথম শিকটার মতোই দ্বিতীয় শিকটাও খুলে আনলো কিশোর। 'এই যে দেখুন জেন্টলমেন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করলো সে, 'প্রথমটার মতো এটাতে···'

একে অন্যের দিকে চেয়ে হাসলো রবিন আর মুসা। লেকচার দেয়ার সুযোগ ভালোই পেয়েছে আজ গোয়েন্দাপ্রধান।'

একুশ

সাতদিন পর মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

'এসো এসো, বসো,' বললেন পরিচালক।

'থ্যাংকিউ, স্যার,' প্রায় একই সংগে বললো তিন কিশোর।

রিপোর্টের ফাইলটা এগিয়ে দিলো রবিন।

প্রত্যেকটা পাতা মন দিয়ে পড়লেন পরিচালক। মুখ তুললেন, 'কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। ওই বিশ্রী যন্ত্রটা, মেটাল গ্রেডার। ডাক্তার হ্যালোয়েন আর ব্রড কি তোমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যেই ফেলে রেখে এসেছিলো?'

'না, স্যার,' জবাব দিলো রবিন। 'ডাক্তার বলেছে, আমাদেরকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখার জন্যেই ইয়ার্ডে পুরনো গাড়িতে ভরেছিলো। পরে সময়মতো ছেড়ে দিতো। কিংবা এমন কাউকে ফোন করতো, যে গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে পারে। ক্রেন যে আমাদের গাড়িটা তুলে নিয়েছে সেটা নিতান্তই নাকি অ্যাক্সিডেন্টাল।'

'হুঁ,' মাথা ঝোঁকালেন পরিচালক। 'ওরকম বিপজ্জনক জায়গায় রাখাটাই উচিত হয়নি ওদের। আরো কতো জায়গা ছিলো রাখার। আচ্ছা, যা-ই হোক, টোল কিনের

ব্যাপারটা কি? সে এই কেসে কোথায় ফিট করছে? ভিকটরকে কি সেই বের করেছিলো, জখম করেছিলো? গরিলাটা যে রাতে ছাড়া পেলো, সে-রাতে বনের মধ্যে কি করছিলো সে? সে-ও কি চোরাচালানীদের একজন?'

'না, স্যার। চোরাচালানীদের লোক নয় সে। তাড়িয়ে দেয়ার পরেও জাঙ্গল ল্যাণ্ডে এসেছে, তার কারণ ডাক্তারকে সন্দেহ করেছিলো। টোল কিনকে ধরে জিজ্ঞেস করেছে পুলিশ। সে জানিয়েছে, ডাক্তারই নাকি মিস্টার কলিনসের কাছে তার বদনাম করেছে, বলেছে, জন্তুজানোয়ারের সংগে দুর্ব্যবহার করে। তাকে তাড়িয়ে ব্রডকে চাকরি দিয়েছেন কলিনস ডাক্তারের কথায়ই। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে কিন চুরি করে ঢুকেছিলো বটে, কিন্তু ডাক্তারের নজরে পড়ে গিয়েছিলো। আর সেজন্যেই ভিকটরকে ছেড়ে দিয়েছে ডাক্তার, দোষটা কিনের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে।

'ভিকটরের পায়ের কাটাটা একটা দুর্ঘটনা। জঙ্গলের মধ্যে কোনোভাবে কেটেছে। এই দোষটাও কিনের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছে ডাক্তার। আমাদেরকে বনের মাঝে ফেলে রেখে গেছে কিন, শুধু মজা করার জন্যে। সে অন্তত তা-ই বলেছে।

'ব্রডকেও সন্দেহ করেছে কিন। সে-রাতে ব্রডের ওপর চোখ রাখার জন্যেই ঢুকেছিলো বনে। গরিলাটা ছাড়া পাওয়ার পর ব্রডের মতো সে-ও ভয় পেয়ে যায়। দৌড়ে পালানোর সময় দেখে ফেলি আমরা তাকে।'

'চিতাটাকে ছাড়লো কে? ডাক্তার?'

'না। ওটা সত্যি সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট। ডাক্তার বরং আমাদেরকে বাঁচিয়েছে, চিতাটাকে গুলি করে।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'এই কেসে অ্যাক্সিডেন্ট, কাকতালীয় ব্যাপার বড় বেশি বেশি হয়েছে। তবে হয় এরকম। এসবের কোনো ব্যাখ্যা নেই।' ফাইলের একটা পাতা ওল্টালেন। 'এখানে লিখেছো, মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন সিনের সংগে কাজ করতো মাইকেল হ্যামার।'

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো, 'তিনি ফায়ারআর্ম এক্সপার্ট। ওরকম একজন লোক দরকার ছিলো সিনের। কাজেই ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয়নি হ্যামারের। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে ঢুকে চোরাচালানীদের ওপর চোখ রাখায় সুবিধে হয়েছে এতে। সিন অবশ্য এসবের বিন্দুবিসর্গ জানে না। তার একজন লোকের দরকার ছিলো, কম পয়সায় পেয়েছে ব্যস।'

'চোরাচালানীদের সর্দার কে? ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। আফ্রিকা থেকে শিকের ভেতরে ভরে হীরা আনানোর পরিকল্পনাও পুরোটাই তার। তানজানিয়ার মুয়াদুই আর শিনইয়াঙ্গা জেলার খনি থেকে চুরি করা হয়েছে হীরাগুলো। নিয়ে আসা হয়েছে দারেস সালামে। সেখানে সিলভার কলিনসের পাঠানো জানোয়ারের খাঁচায় ভরে দেয়া হয়েছে। তারপর তার করে দিয়েছে হ্যালোয়েনকে। সিলভার কলিনস কিছু জানেন না এসবের।'

'আসামাত্রই ভিকটরের খাঁচা থেকে কেন হীরাগুলো বের করে নিলো না হ্যালোয়েন?'

'ভেবেছিলো, খাঁচার মধ্যে রয়েছে, থাক না, নিরাপদেই আছে। তার জানা ছিলো, আরেকটা শিপমেন্ট আসছে, গরিলার খাঁচায় করে। দুটো একসংগে বের করে নিয়ে গায়েব হয়ে যেতো জাঙ্গল ল্যাণ্ড থেকে। বিক্রি করে টাকা ভাগাভাগি করে নিতো দলের সবাই। কিন্তু গরিলাটা আসতে দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অসুখে পড়লো হ্যালোয়েন, সর্দিজ্বর। আর ওদিকে ভিকটরকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন উইলবার কলিনস, খাঁচাটা দিলেন ফেলে। ভেঙেচুরে ফেলা হলো ওই খাঁচা।

'এই চোরাচালানের খবর কিভাবে পেয়েছে কাস্টমস, জানায়নি আমাদেরকে হ্যামার। জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললো, "সরি, এটা অফিশিয়াল সিক্রেট, ফাঁস করা যাবে না।"

ফাইলে টোকা দিলেন পরিচালক। 'আসল কথাটাই জানা বাকি এখনও। ভিকটর নার্ভাস হয়ে যেতো কেন?'

'আপনি তো জানেন, স্যার,' জবাবটা দিলো মুসা, 'বাড়ির কাছ দিয়ে অপরিচিত কাউকে যেতে দেখলে অস্থির হয়ে ওঠে কুকুর। আর সেই লোক যদি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করে তাহলে তো ঘেউ ঘেউ করে বাড়ি মাথায় তোলে। ভিকটরের ব্যাপারটাও হয়েছে তাই। বুনো জানোয়ার, কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল। তাকে অস্থির করেছে হ্যামার আর ডারেল। রাতে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, খোঁজাখুঁজি করেছে। ওই দুটো লোককে আমরাই পছন্দ করতে পারছিলাম না, ভিকটর করবে কিভাবে?'

'তা ঠিক।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পরিচালক। 'একটা ব্যাপার এখনও বুঝতে পারছি না, হ্যালোয়েনের মতো একজন ডাক্তার চোরাচালানে জড়িয়ে পড়লো কি করে?'

'টাকার লোভ, স্যার,' বললো কিশোর। 'জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আসার আগে আফ্রিকায় ছিলো। নানা জায়গায় চাকরি করেছে। সবগুলো চাকরিই ছিলো কম বেতনের। টাকার টানাটানি লেগেই থাকতো। এই সময় একদিন পরিচয় হলো সিলভার কলিনসের সংগে। আফ্রিকার অনেক জায়গা ঘুরেছে হ্যালোয়েন। কোথায় কোথায় হীরা পাওয়া যায় জানে। চোরাচালানের চিন্তা ঢুকলো মাথায়। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে জানোয়ার পাঠানোর কথা শুনে পাকা করে ফেললো পরিকল্পনা। কথায় কথায় সিলভারকে বললো একদিন, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে চাকরি করতে চায়। চাকরিটা পেতে কোনো অসুবিধেই হয়নি হ্যালোয়েনের। তারপর আর কি···'

'হুঁ, সেই পুরনো প্রবাদঃ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'